???? ??????? ??? ????

এক টুকরো লম্বা কাপড় একটি দেশের জাতীয় পোশাক হতে পারে এটা তাকাহাশি সাইতর চিন্তার মধ্যে নাই। অবশ্য সে নিজেই যেন বিচিত্র পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ । অন্তর্মুখী মানুষটি স্বল্প ভাষী হলেও তার ছোট ছোট এক জোড়া চোখ যেন ভীষণ কৌতূহলী এবং চঞ্চল । ইংরেজি ভাষা অনুশীলনের একটি দলে প্রথম তাকাহাশি সাইতর সাথে লিরিক লিরার পরিচয় । জাপানের এই দ্বীপটার নাম হক্কাইদো ।এই সুন্দর দ্বীপটায় বিদেশিদের জন্য অনেক রকমের আয়োজন আছে । ভাষা সংস্কৃতি বিনিময় কেন্দ্রে প্রতি সপ্তাহে ইংরেজি ভাষায় একটি অনুষ্ঠান হয়।

সেখানে জাপানিজ সহ অনেক দেশের নাগরিকরা ইংরেজি ভাষায় তাঁদের নিজস্ব পরিচয় তুলে ধরে । এইতো ছয় মাস যাবত লিরিক লিরা সেখানে নিয়মিত যাচ্ছে । গত মাসের কথা । হঠাৎ মধ্যম উচ্চতার একজন যুবক লিরিক লিরার পাশে হাসি মুখে বসলো । সবাই তখন নিয়মিত আলাপ আলোচনা করছিল । পাঁচ ছয় মিনিট হবে লিরিক লিরা একটা জিনিস লক্ষ্য করতে লাগলো । পাশে বসা জাপানিজ ছেলেটি বার বার তার চোখের দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছে। অনেক কৌতূহলে ভরা তার সে চাহনি । লিরিক লিরা কিছুটা অস্বস্তিবোধ করতে লাগল । সে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেও না বুঝার ভান করে আলোচনায় মনোযোগ রাখলো । অনেকক্ষণ যাবত কথার মাঝ পথে তার মনোযোগ লিরিক লিরার চোখের দিকে চলে যাচ্ছে । সে যেন মনে মনে কি বলে যাচ্ছে ! লিরিক লিরার পাশে বসা অনেকেই হয়তো ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। সব কিছু বুঝলেও লিরিক লিরা খুব স্বাভাবিক ভাবে নিজের মনোযোগ ধরে রাখল। হঠাৎ সেই জাপানিজ যুবক বলে উঠল ," আমি খুব দ্বন্দ্বে পড়েছি । " পাশে বসা দুই একজন সঙ্গে সঙ্গে উৎসুক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো ,কেন মিস্টার তাকাহাশি সাইত ?

আচমকাই পাশে বসা লিরিক লিরার দিকে ঝুকে সে জিজ্ঞেস করল তুমি কোন দেশ থেকে এসেছ?তোমার চোখ দুটো বড় এবং খুব সুন্দর করে সাজানো ।তোমার দেশের সবার ই এমন চোখ ?
তার প্রশ্ন করার ধরন দেখে অনেকের মুখে হাসি চলে এলো ।যদিও সবাই ভদ্রতার প্রয়োজনে পুরো হাসি হাঁসতে পারল না । অর্ধ হাসি মাখা মুখ নিয়ে সবাই আরও একটু বেশি মনযোগী হয়ে বসলো । লিরিক লিরা একটু
অপ্রস্তুত হলেও খুব স্বাভাবিক ভাবে বলল, "আমার নাম লিরিক লিরা এবং আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি । এখানে আন্তর্জাতিক সংস্ক্রতি বিষয়ে গবেষণা করছি । "
বাংলাদেশ ।তাকাহাশি সাইত কপাল কুচকাল ।মনে হচ্ছে এই প্রথম সে বাংলাদেশের নাম শুনেছে । পাশের একজন বৃদ্ধ মতো জাপানিজ ভদ্রলোক বললেন, এক সময়ে এই দেশটা ইন্ডিয়া র অংশ ছিল .১৯৪৭ সালে ভেঙ্গে পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া ছিল । পাকিস্তানের দুটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান । ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে হয়েছে বাংলাদেশ ।

তাকাহাশি সাইত একটু জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, অনেক ভাঙ্গা চুড়া । আসলে পৃথিবীর মানচিত্র সম্পর্কে আমারই ধারনা কম ।

কিন্তু তোমাকে দেখে দক্ষিণ এশিয়ার কোন মেয়ে মনে হয়নি ।অনেক বেশি সংমিশ্রিত তুমি ।
লিরিক লিরা মজা করে বলল ,"আমারও তাই মনে হয় ! "
পাশের একজন বৃদ্ধ মহিলা জানতে চাইলো তোমার এমন মনে হওয়ার কারন কি?
লিরিক লিরা বলল ,"আমরা সংকর জাতি । শুধু তাই নয় কঠিন ইতিহাস আমাদের ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আমাদের কাছে অনেক ভাষা এবং সংস্কৃতির ছোঁয়া ও রেখে গেছে । কারো কারো রক্তে অজানা সংমিশ্রিত গোপন ভালবাসা ও বহমান । তাই হয়তো কখনও কখনও জাতি নির্ধারণ কঠিন হয়ে পড়ে । "

তাকাহাশি সাইত বলল, খুব কঠিন কথা । তবে বিশ্বায়নের এই যুগে সঠিক ভাবে জাতি নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে । তো তোমার দেশের জাতীয় পোশাক সম্পর্কে কিছু বল । লিরিক লিরা সামনে রাখা নোট খাতার সাদা পাতায় একটি সাধারন শাড়ি পড়া মেয়ের ছবি এঁকে বুঝানোর চেষ্টা করল ।
"শাড়ি !" এই পোশাকটার নাম শাড়ি ।তাকাহাশি সাইত বিস্ময় ভরা কণ্ঠে যেন আরও একটু বেশি উচ্ছলতা প্রকাশ পেলো । তার জানার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল । আশে পাশে বসা সবাই তাকাহাশি সাইতর চঞ্চলতা উপভোগ
করতে লাগল ।আমার বাস্তবে শাড়ি পরা একটি মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে ।জানিনা তোমার আঁকা ছবিটা নাকি বাস্তবের মেয়েটা সুন্দর হবে । আমি বুঝতে পারছি না একটা লম্বা কাপড় কেমন করে শাড়ি নামের পোশাক এ পরিনত হয়।
লিরিক লিরা বলল , আমি একদিন তোমাকে এই পোশাকটা পড়ে দেখাব ।
তাকাহাশি সাইত খুব আনন্দ পেল ।তার চখে মুখে কথায় আচরনে নতুন বিস্ময়ের ছোঁয়া দেখা গেল ।
"তুমি এই পোশাকটা পরে আমার সামনে দাঁড়াবে ।আমার দিকে তাকিয়ে হাসবে । উফ! আমি একদম বিশ্বাস করতে পারছিনা —!"
তাকাহাশি সাইতর কথা শেষ না হতেই লিরিক লিরা বলল ,সেটা খুব শীঘ্রই তোমার চোখ বাস্তবে দেখবে । তোমাকে শুধু গ্রীষ্মকাল এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
গ্রীষ্মকাল এর জন্য কেন ?
লিরিক লিরা উত্তর দিল ,শাড়ি শীতকালের উপযোগী পোশাক নয় !
এটা আমার জন্য খুব কঠিন ।কারন গ্রীষ্মকাল শুরু হবে আরও দুই মাস পর।শাড়ির প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে তমাকে অপেক্ষা করতেই হবে ।তাকাহাশি সাইত আবার প্রশ্ন করল ,শীতকালে কি শাড়ির প্রকৃত সৌন্দর্য হারিয়ে যায় ?লিরিক লিরা বলল, শাড়ির সাথে বাতাসের এবং চারপাশের প্রকৃতির রঙের এক গভির সম্পর্ক আছে । প্রকৃতির বিচারে শাড়ির অনেক রকমের ব্যাবহার আছে । একজন নারী যখন শাড়ি পরে প্রকৃতি তাকে অনেক রকমের রূপ দেয় ।
তোমার দেশে কয়টি ঋতু ?
ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ ,প্রতি দুই মাস পর পর ছয়বারে প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে সাঁজে । তাকাহাশি সাইত একটু মজা করে বলল ,বুঝলাম তোমার দেশের প্রকৃতি একটু বেশি চঞ্চল ।খুব দ্রুত মেজাজ পাল্টায় !
এভাবে প্রতি সপ্তাহে লিরিক লিরা এবং তাকাহাশি সাইতর কথা বার্তা হয় ।ভাষা সংস্কৃতি জীবন পদ্ধতি এবং মানুষ । অনেক কৌতূহল আর প্রশ্ন !

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ ,প্রতি দুই মাস পর পর ছয়বারে প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে সাঁজে । তাকাহাশি সাইত একটু মজা করে বলল ,"বুঝলাম তোমার দেশের প্রকৃতি একটু বেশি চঞ্চল ।খুব দ্রুত মেজাজ পাল্টায় !"
এভাবে প্রতি সপ্তাহে লিরিক লিরা এবং তাকাহাশি সাইতর কথা বার্তা হয় ।ভাষা সংস্কৃতি জীবন পদ্ধতি এবং মানুষ । অনেক কৌতূহল আর প্রশ্ন ! লিরিক অত্যন্ত আন্তরিকতার
সাথে উত্তর উপস্থাপন করে ।কয়েক সপ্তাহে খুব বন্ধুত্ব এবং আন্তরিকতার জোয়ারে কেটে গেল । তবে বন্ধুত্বের রূপ দেখে কারও

বুঝবার উপায় নেই খুব অল্প সময়ের এক সম্পর্ক । কোন সপ্তাহে দুজনে একসাথে কথা বলতে বলতে অনেকদূর হেঁটে যাওয়া ।কখনও এক সাথে ইয়াকি সোবা নুডুলস কিংবা অরগানিক সবজি রেস্টুরেন্ট এ সালাদ দিয়ে
মধ্যাহ্ন ভোজ করা । কখনও আবার হিম শীতল তুষারপাতের বিকেলে এক সাথে কফি হাউস এ গরম কফি পান করা । কোন কোন বন্ধের দিন গুলোতে এক সাথে জাপানিজ ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান উপভোগ করা ।কখনও বাংলা সাহিত্য এর বিখ্যাত সৃষ্টি গুলো ইংরিজিতে তুলে ধরা ।বেশ জমজমাট ভাবে একটি সাধারন ছোট্ট সম্পর্ক এক অসাধারন আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে যেতে লাগলো । তুষার ঢাকা সফেদ গালিচার মতো পথে তুষার ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাশাপাশি নীরব হেটে যাওয়া । গভীর অন্ধকার আকাশ থেকে আসা একটু সন্ধ্যা আর সেই সন্ধ্যার আলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে নামা তুষার কনা ।অনেক অনেক নিরবতা ! কখনও কখনও সেই নিরবতা একটু গোপন হয়ে উঠে মনের কোন এক পরিবেশে । লিরিকের পাশের বোঁচা নাকের সাদা ধব ধবে চেহারার এই লাজুক যুবকটি কখনও হয়তো তার মনের কথাটি বলতে পারবে না ।চারদিকে শীতের ভয়ংকর উচ্ছ্বাস ।সেই উচ্ছ্বাসে তুষার কনা গুলো সাদা পাখির মতো হিমশীতল বাতাসের সাথে অদ্ভুত খেলা খেলছে ।তাকাহাশি সাইত ক্রমশ ঘেমে উঠে ।লিরিক মোবাইল ফোন এ দেখল শীতের তাপমাত্রা মাইনাস দশ ডিগ্রী ।বেশিক্ষণ বাইরে থাকা যাবেনা । তুষার ঢাকা আকাশে লিরিক বাংলাদেশের গোধূলি খুঁজে ।হঠাৎ তাকাহাশি সাইত বলল ,লিরিক নামটাও কিন্তু
ইংরেজি । লিরিক মাথা নেড়ে বলল , বাংলা অর্থ হল গীতি বা গান ।

তাকাহাশি সাইত একটু স্বাভাবিক ভঙ্গি নিয়ে বলল , তোমাকে আমার সত্যিই লিরিকেল মনে হয় ।তাই কৌতূহলী হয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকি ।তোমার বাংলাদেশি বড় উজ্জ্বল কালো চোখ দুটো আমার ভালো লেগেছে। ওর বোকা বোকা কথায় লিরিক লিরা হেসে উঠে ।হাঁসতে হাঁসতে বলে আমাদের দেশটা আরও অনেক বেশি লিরিক্যাল । অনেক বিচিত্রতায় ভরপুর।
তোমার নাম টা বাংলা না হয়ে ইংরেজি হল কেন? এবার লিরিক হাসি থামিয়ে একটু নিঃশ্বাস নিয়ে বল্ল,আসলে ইংরেজি অনেক শব্দ আমাদের পূর্ব পুরুষদের শব্দ ব্যাবহারের ইতিহাস থেকে পাওয়া ।
যেমন—
এই ভু খণ্ডের মানুষদের এক সময়ে ইংরেজরা শাসন করেছে ।তাই ইংরেজি অনেক শব্দ আমাদের কথাতে জীবন যাপনে নিজ অধিকারে রয়ে গেছে ।মানুষ হয়তো ঐ শব্দ গুলোর প্রকৃত বাংলাই ভুলে যাচ্ছে ।তাকাহাশি সাইত বলল, যদিও ব্যাপারটা একই সাথে দুঃখ জনক এবং মজার । তবে সব দেশের মানুষেরই নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতির চর্চা করা উচিত। প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আর নিজস্ব সংস্কৃতি তে তা বসবাস করতে দেওয়া এক নয়। লিরিক একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বলল, ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর পাকিস্তান আমাদের শাসন শোষণ করেছিলো । তাই তাদের ও কিছু জিনিস আমাদের সংস্কৃতি তে আছে । শুধু তা নয় আরবি ,ফার্সি ,ফরাসি,হিন্দি এবং সংস্কৃত এমন অনেক অনেক ভাষার কিছু শব্দ বিদেশি শব্দ হিসাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কথা বার্তায় ব্যবহৃত হয় । তাকাহাশি সাইত চোখ বড় করে খুব গম্ভির মুখ করে
বলল, যুদ্ধের ভয়াবহতা আমি বুঝি । আমি ইতিহাস থেকে জেনেছি । জাপানের হিরোশিমায় বাতাসে এতো বছর পর ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অভিসাপ ভাসে । তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমরা প্রতিনিয়ত একটা যুদ্ধের মধ্যে আছো ।
লিরিক লিরা বলল , একদম ঠিক । বাংলাদেশ নামক ভু খণ্ড টি সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে । তাই যুদ্ধই আমাদের স্বাভাবিক জীবন ।
তাকাহাশি সাইত খুব বিনয়ের সাথে বলল ,আমি ভেবে অবাক হচ্ছি এতো টিকে থাকার যুদ্ধের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস ,সরলতা ,জীবনের প্রতি সম্মান আর ভালবাসা কেমন করে পেলে তুমি ? লিরিক লিরা একটু আন্তরিকতা নিয়ে বলল ,আমাদের উর্বর মাটির ঘ্রান ,অন্ধকার আকাশের জ্যোৎস্না ,বৃষ্টির বিলাসিতা আর দু মাস পর পর প্রকৃতির রঙ বদলই এসব প্রাকৃতিক নিয়মে শিখিয়ে দিয়েছে । তাকাহাশি সাইত একটু মুচকি হাসি মাখা মুখ নিয়ে বলল ,দুই মাস পর জাপানে বসন্ত আসতে শুরু করবে বাংলাদেশে কি হবে ?লিরিক লিরা
অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে বলল ,বাংলা নব বর্ষ ।তখন ইংরেজি ১৪ এপ্রিল বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে । সে সময়

সারা দেশ বৃহৎ আনন্দে মেতে উঠবে ।ছেলে মেয়েরা লোকজ সাঁজ সজ্জা আর রঙ্গিন পোশাকে ঘুরে বেড়াবে ।বিশেষ করে মেয়েরা লাল শাড়ি পড়বে ।সবাই প্রিয় জনকে উপহার দিবে ।

তাকাহাশি সাইত বলল ,লাল শাড়ি কেন?

আসলে লাল সাদা রঙের এক অদ্ভুত সমাহার! বেশির ভাগ এই রঙ ব্যাবহার করলেও যেকোন উজ্জ্বল রঙ্গিন রঙের শাড়ি ও পড়ে ।- -কথা গুলো বলতে বলতে সামনে অদুরি পার্কের পাশে রাখা চেয়ারে বসলো ।অনেকক্ষণ দুজনে হেঁটেছে ।তাই দুজনে একটু ক্লান্ত ।তাকাহাশি সাইত মুখোমুখি চেয়ারটাতে খুব আন্তরিকতা নিয়ে বসলো । প্রচুর লোক থাকে এই অদুরি পার্কে ।লিরিক লিরা নিঃশ্বাস ছেঁড়ে আশে পাশে লোকজনের দিকে তাকাল ।তাকাহাশি সাইত ও আশে পাশে একবার তাকিয়ে লিরিক লিরার দিকে চোখ সরাল ।এই প্রথম লিরিক লিরা দেখল তাকাহাশি সাইত তার দিকে সরাসরি তাকাচ্ছে ।জাপানিজ ছেলে মেয়েরা সাধারণত একটু লাজুক স্বভাবের হয়। সব সময় কথা বলার সময় সরাসরি তাকিয়ে কথা বলে না ।মাথা নিচু রাখা ওদের স্বভাব ।লিরিক লিরা বুঝতে পারছে সে হয়ত কিছু বলতে চাচ্ছে। আচমকা শান্ত কণ্ঠে তাকাহাশি সাইত বলল ,তোমার কি রঙের শাড়ি পছন্দ ?লিরিক হাসি হাসি মুখ নিয়ে বলল ,শাড়ি ! আমার লাল শাড়ি পছন্দ ।তবে আমার কাছে এখন কোন লাল শাড়ি নেই ।সামনের পহেলা বৈশাখ আমাকে অন্য রঙের শাড়ি পরতে হবে ।

তাকাহাশি সাইত বলল ,এখানে তুমি মাঝে মাঝে শাড়ি পড়ো?

না ।বাংলাদেশিদের কিছু নিজস্ব অনুষ্ঠান হয় সংগঠন থেকে ।তখন সবাই শাড়ি পড়ে ।

ও আচ্ছা। তুমি ছাড়াও অনেক বাংলাদেশি আছে ?

আছে ,তবে বেশির ভাগ গবেষণা ,চাকুরি, উচ্চ সিক্ষার কারনে এখানে এসেছে স্থায়ী কারও সাথে পরিচয় হয়নি ।

তাকাহাশি সাইত একটু মনোযোগ সহকারে লিরিকের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা গুলো শুনল । তার ছোট ছোট চোখ দুটো যেন এবার ভীষণ স্থির এবং শান্ত ।কি যেন খুঁজছে !

ওর তাকানোর ধরন অনেক কিছু বলতে চাইলো ।অনেক প্রশ্ন আর রহস্য ঘেরা চাহনি ।লিরিক হয়ত অনেক কিছু মনে মনে জেনে গেছে । কিন্তু না ।সে একবার চাহনি লক্ষ্য করে চোখ সরিয়ে নিল ।

কয়েক সপ্তাহ পর ।বরফ ঢাকা পথ প্রান্তর জেগে উঠতে শুরু করলো ।তুষার চাঁদরে ঢাকা আকাশ একটু একটু আলোর ঝলকানি দিতে লাগলো ।ব্যাস্ত শহরের মানুষ গুলো শীতের পোশাক ছেড়ে নতুন সাজে পথ প্রান্তর রাঙিয়ে তুলল ।এ এক প্রকৃতির ভিন্ন রূপ ।পর পর দুই সপ্তাহ তাকাহাশি সাইত ভাষা সংস্কৃতি বিনিময় কেন্দ্রে এলো না ।তার মোবাইল নাম্বার টা নেওয়া হয়নি ।ইমেইলের কোন উত্তর পাওয়া গেলনা ।লিরিক লিরা যেন তাকে মনে মনে খুজতে লাগলো ।সে কি ব্যস্ত নাকি অসুস্থ?অন্য কোন ভুল?খুব সংবেদনশীল মন জাপানিজদের ।কোন কারনে কষ্ট পেয়েছে?এমন অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগলো তার মস্তিস্কে।এভাবেই আরও কয়েকদিন গেল ।সেদিন পহেল বৈশাখ। বিকেলে বাংলাদেশিদের নিজস্ব সংগঠনের অনুষ্ঠান ।লিরিক লিরা কোন কিছু না ভেবেই বাংলাদেশি সাজে হক্কাইদ ভাষা সংস্কৃতি কেন্দ্রে গেল ।সবাই যেন অবাক। সবাই কে পহেলা বৈশাখ অনুষ্ঠান উদযাপন সম্পর্কে বর্ণনা করল ।কিন্তু যাকে মন এবং চোখ খুজছে তাকে দেখা গেল না ।কেন জানি লিরিক লিরার ভীষণ মন খারাপ হল ।তারপর ভাষা সংস্কৃতি বিনিময় কেন্দ্র থেকে ফেরার সময় কথা। হঠাৎ একজন মহিলা অফিস কর্মী পেছন থেকে ডেকে তাকে একটি প্যাকেট দিল ।এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনায় লিরিক লিরা ভাবনা শূন্য হয়ে গেল ।একটি টুক টুকে লাল শাড়ি ।সাথে একটি শুভেচ্ছা কার্ড ।সেখানে লেখা,

পহেলা বৈশাখ শুভেচ্ছা !!

একটি সবুজ মারুয়ামা পাহাড় ,একটি লাল শাড়ি ,একটি বাংলাদেশি মেয়ে এবং তাঁর এক জোড়া কাজল চোখ ।সব মিলে তৈরি হতে পারে একটি ধ্বংসাত্মক ঘটনা ।আমি জেনেছি মেয়েটির একটি মানুষকে ঘিরে একটি সুখের রাজ্য আছে ।সেই মেয়েটির দেশ সংস্কৃতি সম্পর্কে আমি জেনেছি । তার সংস্কৃতি এবং দেশের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা । জানি মেয়েটি আমাকে ক্ষমা করবে।

লিরিক লিরা চুপচাপ শাড়ি এবং কার্ড স্বযতনে হাতে নিয়ে সেই অদুরি পার্কের দিকে হাটতে লাগল ।গরমে একটু একটু ঘাম

কপাল থেকে নেমে গাল ভেজাল।লিরিক লিরা শুধু মনে মনে ভাবতে লাগল সত্যিকারের ভালবাসার অনুভূতি গুলো হয়তো এমনই নিরব আর লুকানো থাকে

?????????? ??????

হোক্কাইডো বিশ্ব বিদ্যালয়ের মেইন গেট থেকে বের হয়ে ডান দিকে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই সাপ্পোরো ষ্টেশন । বেশ বড় ষ্টেশন । এই সাপ্পোরো ষ্টেশন কে কেন্দ্র করে আছে অনেক গুলো শপিং সেন্টার দোকান আর রেস্টুরেন্ট । সাপ্পোরো শহরটা অনেকটা পর্যটক কেন্দ্রিক । প্রতি দিন থাকে অনেক লোক সমাগম এবং বিদেশি পর্যটকের ভিড় । এই শহরটা বেশ সুপরিকল্পিত এবং সুন্দর ।তুষারপাতের সময় গুলোতে সবাই আন্ডারপাস ব্যবহার

করে । সাপ্পোরো ষ্টেশনটার নিচের আন্ডারপাস গুলো ও খুব সুন্দর করে গুছানো ।সেখানে ও টয়লেট থেকে শুরু করে জামা কাপড় ,খাবারের রেস্টুরেন্ট ,লাইব্রেরী এবং জাদুঘর সব কিছুই আছে । যেন মাটির নিচের নিরিবিলি কোন বাসভুমি । শীত কাল শুরু হওয়ার সময় থেকে লোকজনের আন্ডারপাস ব্যবহার বেড়ে যায় । সাপ্পোরো ষ্টেশন এর বেশীর ভাগ ট্রেন লাইন গুলো মাটির নিচে। তাই অধিকাংশ সময় আন্ডারপাস গুলো ব্যস্ত থাকে । দুই বছর আগে পদার্থবিদ ডঃ আলমগির হোসেন টোকিও বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে পিএইচডি শেষ করেছেন । এই তো এক বছর হল নতুন এক গবেষণার কাজে পাঁচ বছরের জন্য হোক্কাইডো বিশ্ব বিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন ।একটি পাঁচ বছরের কন্যা সন্তান এবং স্ত্রী কে নিয়ে সুখের সংসার । তারপর মধ্যে স্ত্রী সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা । এই খবরটা আলমগিরকে আরও বেশি সুখ এনে দিয়েছে । পাঁচ বছরের কন্যা মালিহার খুব আলমণ্ড চকোলেট পছন্দ । আজকের দুপুরে দুইবার মেয়ে ফোন করে বলেছে চকোলেট নিয়ে বাসায় ফেরার জন্য । ল্যাব এ আজ কে অনেক কাজ থাকায় দেরি হয়ে গিয়েছে । এপ্রিল মাসের তুষারপাত । তখন রাত প্রায় আটটা বাজে । এখানে রাত নয়টায় প্রায় সব দোকান বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু বাসায় ফিরলে মেয়ে মালিহা চকোলেট না দেখলে ভীষণ মন খারাপ করবে । আলমগির হোসেন হোক্কাইডো বিশ্ব বিদ্যালয়ের মেইন গেট থেকে বের হয়ে সোজা দুইটা ব্লক পার হয়ে মাটির নিচের রাস্তার দিকে গেলেন । সেখান দিয়ে সাপ্পোরো ষ্টেশনটা একটু সহজ পথ । বেশ কয়েক মিনিট এর ব্যাপার । এখানে মাটির নিচের এই পথ গুলো প্রায় অনেক বড় বড় শপিং সেন্টার ,অফিস, গুরুত্ব পূর্ণ ভবন গুলোর সাথে সংযুক্ত করা । তাই সব পথেই কিছু মানুষ দেখা যায় । অনেকটা পথ হাঁটার পর ও আলমগির আজ হঠাৎ ষ্টেশন এর পথ খুজে পাচ্ছে না । বেশ কিছুক্ষণ । এমন করে হাঁটার পর অনুভব করল এতক্ষণ তো সময় লাগার কথা নয় । প্রায় প্রতিদিন সে এই পথেই ষ্টেশন এর মার্কেট এ আসে । নিজেকে কেমন বোকা মনে হচ্ছে । এমনিতে শীতের রাত । তারপর তুষারপাত হচ্ছে । বেশি রাত করা যাবে না । বাসায় ছোট মেয়ে এবং অসুস্থ অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী । ফিরে যে যাবে সে পথ ও খুঁজে পাচ্ছে না । আন্ডারপাস গুলোতে বিভিন্ন ভাষায় চিহ্ন দেওয়া থাকে কোন পথে বের

হবে । এই ধরনের কিছুই সে পাচ্ছে না ।একটা অদ্ভুত দ্বন্দ্ব নিজের ভিতর তৈরি হল । খুব ঠাণ্ডা অনুভব হল। হাড় হিম হয়ে যাওয়া একটা অনুভুতি মনের কোথাও আচমকা শুরু হল । আশে পাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না । খুব বেশি নিরবতা যেন পুরো আন্ডারপাস জুড়ে । তবে হঠাৎ হঠাৎ ট্রেন আসার শব্দ শোনা গেল । কিন্তু ট্রেন লাইন বা মানুষ জন দেখা যাচ্ছে না । এর মধ্যে ত্রিশ মিনিট চলে গিয়েছে । মার্কেট বন্ধ হয়ে যাবে । এমন ভুল হবার কথা নয় । নিজের উপর খুব বিরক্ত লাগছিল । সেই সাথে একটা অস্বীকৃত ভয় ও কাজ করছিল । একটা অদ্ভুত শিহরণ ! একটা ভয়ংকর আতংক ! মনে হচ্ছিল নিজের পুরো শরীর বরফ জমাট হয়ে গিয়েছে । নিজের কাছে নিজেকে অচেনা মনে হতে লাগল । আরও কয়েক মিনিট এমন করে গেল । তারপর হঠাৎ চোখ পড়ল বামদিকের একটি চলন্ত সিঁড়িতে কে যেন নিচে নামছে । আলমগির আন্ডারপাস থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য দৌড়ে গেল সিঁড়ির দিকে । একটি তের চৌদ্দ বছরের মেয়ে । বাদামী রঙের চুল । পিছনে স্কুল ব্যাগ । কালো রঙের স্কুলের ইউনিফর্ম গায়ে । কালো রঙের জুতা ।ছোট চুল গুলো এমন করে সামনে রাখা যে চেহারা ঠিক মতো বুঝা যাচ্ছে না । আলমগির কে দৌড়ে সিঁড়ির দিকে যেতে দেখে মেয়েটি চুলের ভিতর থেকে বলে উঠল ,ঐদিকে কোন রাস্তা নেই । তুমি এখান থেকে বাইরে যেতে পারবে না ।

আলমগির একটু ভরকে গেল । বুকের কোথাও মোচর দিয়ে উঠলো । আলমগির বলল ,কেন যেতে পারব না ? কি সমস্যা হয়েছে ?

মেয়েটি স্কুল ব্যাগ পিঠে একটু ঠিক করে নিয়ে বলল , তুমি এখন টোকিওতে আছো । বর্তমান থেকে আরও কয়েক বছর পিছিয়ে ।কোন এক অতীত সময়ে ।

আলমগির ভ্রু কুচকালো , কি উল্টা পাল্টা বলছ ! আমার মেয়ে আর স্ত্রী আমার জন্য অপেক্ষা করছে ।

অদ্ভুত মেয়েটি হো হো করে হেসে উঠলো । মেয়েটির হাঁসি দেখে আলমগির এবার একটু ভয় পেল । শুধু তাই নয় । ছোট জাপানিজ মেয়েটি খুব সুন্দর বাংলা ভাষায় কথা বলছে । ব্যপারটা বুঝতে আর বাকি রইল না । আলমগির অনুভব করল অন্য কোন ঘটনা তার চারপাশে ঘটে যাচ্ছে । তবুও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল । আলমগির মেয়েটিকে বলল , তুমি কি অদ্ভুত কিছু আমাকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করছো? তুমি জানো আমি পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম ! এখন ও আমি এই বিষয়ে গবেষণা করছি । পৃথিবীতে তোমাদের অস্তিত্ব অমুলক । ভ্রান্ত কল্পনা ছাড়া কিছু না ।

মেয়েটি একটু এগিয়ে এলো । কাঁধের স্কুল ব্যাগটা পাশে রেখে সিঁড়িতে বসল । আলমগির পথ খুঁজতে লাগল । আরও কয়েক মিনিট এভাবেই গেল ।তারপর মেয়েটি একটি তাচ্ছিলের হাসি দিয়ে বলল ,তোমাদের বিজ্ঞানীদের নিয়ে এই একটা সমস্যা ! সব কিছু নিজেদের দায়িত্বে নিতে চাও । পৃথিবীর সব রহস্য কি তোমরা আবিষ্কার করতে পেরেছ ?তাহলে পৃথিবীতে মানুষের জীবন কেন প্রতি মুহূর্তে নানা দ্বন্দ্ব নিয়ে ঘুরে ?

আলমগির একটু বিরক্ত কণ্ঠে বলল , মানব জীবনের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক । বিজ্ঞান জীবনকে উপভোগ্য আর সহজ করে তোলে । সেখানে এমন কল্পনা শুধুই বিনোদন ।

তার মানে তুমি বলতে চাও এখন যা কিছু সব কল্পনা আর বিনোদন ?

আলমগির একটু থেমে গেল । তার পর আমতা আমতা করে বলল , হয়তো আমার মনের কোন বিভ্রান্তি মেয়েটি কে দেখতে এখন অনেকটা কুঁজো বুড়ির মতো মনে হচ্ছে। ঠিক যেন একশ বছর বয়সের কোন বুড়ি স্কুল ড্রেস পড়ে আছে ।ঠোটে আর মুখে নরম চকলেট লেগে আছে । তারপর বুড়ি ঘাড় বেঁকিয়ে বলল ,পৃথিবীর নিজস্ব নিয়ম আছে যা সব আবিষ্কারের উপর । তুমি যা করবে তাই তুমি পাবে । আজ অনেক বড় দুর্ঘটনা তোমার সামনে !

আলমগির বলল , কি দুর্ঘটনা ! আমাকে কেন উল্টা পাল্টা চিন্তা করতে বাধ্য করছ ?

কয়েক বছর আগে তোমার এক বন্ধু তার নব বিবাহিতা বউ নিয়ে তোমার কাছে বেড়াতে এসেছিল ।

আলমগির বলল , আমার বিশ্ব বিদ্যালয়ের বন্ধু । আমি তাকে অনেক আপ্যায়ন করেছিলাম ।

বুড়ি হো হো করে হেঁসে উঠলো । খুব শীতল কণ্ঠে আলমগির এর কানের সামনে এসে বলল , সেই আপ্যায়নের মাঝেই জমে

রাখা তোমার মনের কুৎসিত হিংসুটে ইচ্ছাটা ও পূরণ করেছিলে ।

আলমগির বলে , আমি ছিলাম সব চেয়ে ভাল ছাত্র । এটা সত্যি ওর জীবনের পরবর্তী সাফল্য আর সুন্দর জীবন সঙ্গী পাওয়াটা আমাকে ওর সামনে তুচ্ছ করে দিচ্ছিল । তখন আমার মনের কোথাও একটা ধ্বংস অনুভব করেছিলাম । আমি কোন ভাবেই ওর উচ্ছল জীবন আর সুখ মেনে নিতে পারছিলাম না ।

বুড়ি বলল,তাই তুমি নিজের অনেক দিনের বন্ধুত্ব ভুলে হিংসাটাকে মূল্যবান করে তুললে । একটা সুন্দর সংসার ভেঙ্গে দিলে ! আর এখন নিজের সুখের সংসার নিয়ে ব্যস্ত । একবার কি নিজের বিবেকের মুখোমুখি হয়েছিলে ?

আলমগির বলল , পরিনতি এতো ভয়ংকর হবে আমি ভাবিনি । আমি শুধু ওর সুখটা সহ্য করতে পারছিলাম না । সেটাই শুধু ধ্বংস করতে চেয়ে ছিলাম ।

বুড়ি বলল , তোমার বন্ধুর বিশ্বাসটা তোমার উপর নির্ভর করতো ।

আলমগির একটু উত্তেজিত হয়ে বলল , আমি ভাল ছাত্র এবং বুদ্ধিমান । আমি আমার চিন্তা দিয়ে সবাইকে নিয়ন্ত্রন করি । আমি চাইনা কেউ আমার উপরে থাকুক ।

বুড়ি বলল , সে কি খারাপ ছাত্র ছিল ? আসলে তোমার ভিতরে এক ভয়ংকর হিংসুট আত্মার বসবাস ।

আলমগির বলল , সে খারাপ ছাত্র ছিলনা । সে ছিল সাধারন আর নিরব। পৃথিবীতে কম বেশি সবার মধ্যেই হিংসার উপস্থিতি আছে ।

বুড়ি একটু অন্য রকম হাঁসি দিয়ে বলল , কিন্তু সেই হিংসা তোমার মতো ধ্বংসাত্মক নয় । যে ধ্বংস তুমি ডেকে এনেছিলে সেই ধ্বংসে এখন তুমিই পড়তে যাচ্ছো । ভালবাসাহীন হৃদয় শুধু হিংসার আগুনে পুড়ে । যার পরিনাম শুধুই ধ্বংস ।

হঠাৎ আলমগির ছটফট করতে লাগল । তারপর বুড়ি কে বলল , আমি ক্ষমা চেয়ে নিব ।

বুড়ি বলল , ক্ষমা ! তুমি যখন নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে মেয়েটির নামে কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিয়ে বন্ধুর কান ভারী করলে ।ঠিক সেই সময় থেকে একটি সংসারের সুন্দর মুহূর্ত গুলো পারস্পারিক ভুল বুঝা বুঝিতে ধ্বংস স্তূপে চাপা পরতে লাগল । আত্ম সম্মান রক্ষার্থে সেই মেয়েটি আত্মহনন বেছে নিল । দুঃখ জনক মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল । তোমার হিংসা বোধের আগুনে দুইটি জীবন ফুরিয়ে গেল । একজন মানুষ হিসেবে তোমার কি মূল্য আছে?

বুড়ির কথা গুলোতে আলমগির কেমন যেন একটা ধাক্কা খেল । অ্যান্ডারপাস এর এক সিঁড়িতে বসে পড়ল । মনে হচ্ছিল শরীরের সব শক্তি ফুরিয়ে গেছে । অনেকটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল । এভাবে কতোটা সময় গেছে আলমগির জানে না । হঠাৎ কানের কাছে লোকজন চলাচলের শব্দ শুনতে পেল । সামনেই আট নাম্বার গেট উপরে উঠে আসার । বাইরে বের হওয়ার সময় যেন কেউ তার পাশ দিয়ে গেল । একটা অদ্ভুত সুন্দরী কোন তরুণী । দেখতে ঠিক কার মতো যেন । মনে করতে পারছে না । তার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাঁসি দিল । অনেক পড়ে মনে হল তাঁর বন্ধুর সেই মৃত স্ত্রীর মতো । কথা গুলো ভাবতে ভাবতে আলমগির মোবাইল ফোনে তাকিয়ে দেখে একশো কল এসেছিল । বাসায় ফোন করে জানতে পারল তার স্ত্রীর অবস্থা খুব খারাপ । মেয়ের জন্য আর চকলেট নেওয়া হলনা । ঝরের বেগে তুষার উপেক্ষা করে বাসায় ফিরল । অবস্থা সঙ্কটাপন্ন অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী কে নিয়ে হাসপাতালে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল । ডাক্তার কিছুই জানাল না । পাঁচ বছরের মেয়ে বাবার পাশে নির্বাক বসে রইল । মধ্য রাত পেরিয়ে যখন পৃথিবী নতুন সূর্য দেখবে ঠিক তখন ডাক্তার ভিতর থেকে ভয়ংকর খবরটা নিয়ে এলো । পরের দিন টা শুরু হল অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে হারানোর দুঃখ নিয়ে । যে দুঃখ প্রকৃতির নিয়মে কোন একদিন সে নিজেই তৈরি করে ছিল । আলমগিরের ভিতরের আত্মগ্লানি আর হাহাকারের শব্দ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে গেল ভোরের আলোয় । পৃথিবীর কোন আবিষ্কার পারবে না তার পুরনো ভালবাসা আর জীবন ফিরিয়ে দিতে । সময় কোন এক অদ্ভুত রহস্যে মিটিয়ে নেয় তার সব দাবি ঠিক সময় মত ।

???? ??????????? ???????? ???????

সেদিন প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছিল । তখন ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ । চারিদিকে বরফের উৎসব । হোক্কাইডো দ্বীপটা যেন সাদা বরফ চাঁদরে ঢেকে আছে ।কিছুক্ষণ পর পর ঘূর্ণি বাতাস । দরজা খুলে বাইরে তাকানোর উপায় নেই । দিন টা ছিল শনিবার । ছুটির দিন । একটু অলস মন আর এক কাপ ব্লাক কফি নিয়ে আমি অনলাইনে পত্রিকা পড়ছিলাম । পৃথিবীর সব মানবিক বিপর্যয়ের খবর গুলো আমাকে একটু উদাস করে রেখে ছিল । আমি মনটা কাজে বসাতে পারছিলাম না । কেমন একটা অস্থিরতা মনের কোথাও দুমরে মুছরে দিচ্ছিল । মনের এই অস্থিরতা কে ভুলে থাকতে এবং সময় টাকে সুন্দর করে উপভোগ করার জন্য চিন্তা টা কে অন্য দিকে নেওয়ার চেষ্টা করলাম ।

তাই ভালো কোন বই কিংবা পত্রিকার বিষয় খুঁজছিলাম । প্রতিটা পত্রিকা জুড়ে শুধু ভাঙা চূড়ার বিষয় গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । উৎসাহ পাওয়ার মতো কিছুই যেন পাচ্ছিলাম না । কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না । বেশ মনোযোগ সহকারে এমন কিছু বিষয় খুঁজছিলাম যা আমাকে উৎসাহ দিবে । আমি যেন নিজেকে আত্মবিশ্বাসী ভাবতে পারি । আমার ভিতরের মানবিক বোধ গুলোকে আরও বেশি সচেতন এবং সাহসী করে তুলবে । সময়টা সকাল ফুরিয়ে মধ্যাহ্ন ছুঁই ছুঁই করছে । হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠলো । আমি একটু অবাক হলাম । কারন বাইরে তখন তুষারপাত । এই সময়ে কেউ প্রয়োজন ছাড়া বাসা থেকে বের হয় না । আমি একটু অলস ভঙ্গিতে কফি হাতে নিয়েই দরজা খুললাম ।বাইরে থেকে প্রচণ্ড বাতাসের ধাক্কা ।খুব তুষারপাতের কারনে কিছুই দেখা যাচ্ছিলোনা । ঘূর্ণি বাতাসে তুষার গুলো এলো মেলো ভাবে এক অদ্ভুত ধোঁয়াটে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে । আমি ভাল ভাবে তাকাতে পারছিলাম না । দুজন জাপানিজ মহিলা ।
কয়েক সেকেন্ড এর মধ্যে একটু যেন বাতাস থামল ।আমি তখন জাপানিজ ভাষা জানি না । আমি এটা ও নিশ্চিত না যে তারা ইংরেজি পারে কিনা । একটু সামান্য দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে কাজ করছিল। তাই আমি তাদের ইশারা ইঙ্গিত করে বাসা দেখিয়ে বুঝালাম ভিতরে আসতে । আমার ইশারা ইঙ্গিত ভাষা দেখে মজা পেয়ে হেঁসে দিল ।ওরা আমার বাসার ভিতরে ঢুকল খুব লাজুক ভঙ্গিতে । ওদের চোখে খুব কৌতূহল । আমি স্বাভাবিক করার জন্য কফি মগ দেখিয়ে বুঝালাম কফি খাবে কি না । ওরা হাসল । আমি দুই কাপ কফি তৈরি করলাম ।খুব অল্প সময়ের মধ্যে কফি আন্তরিক ভাবে তাদের হাতে তুলে দিলাম । ওরা যেন ভীষণ লজ্জা পাচ্ছে তা ওদের হাঁসি দেখে বুঝা যাচ্ছিল । এখানে অনেক শিক্ষিত জাপানিজ ইংরেজি জানে না কিংবা জানলেও ওরা অন্য ভাষায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না । কিছুটা সময় এমন করেই গেলো । আমরা পাশা পাশি বসে চুপ চাপ কফি খাচ্ছিলাম । হটাৎ একজন ইংরেজিতে জানতে চাইলো তুমি নিশ্চয়ই এশিয়ার দেশ বাংলাদেশ থেকে এসেছ?
আমি তো হতবাক । তার বুদ্ধি মত্তা আমাকে আকর্ষণ করলো । খুব স্বাভাবিক ভাবে আমাকে দেখে অনেকে বুঝতে পারে না । কেউ ভাবে আমি ইনডিয়ান ,কেউ পাকিস্তানি ,কেউ বা ভাবে নেপালি অথবা অন্য কোন
দেশের ।আমি যেন একটু চমকে গেলাম । মনের মধ্যে প্রচণ্ড আনন্দ অনুভব করলাম ।

আমি ও ইংরেজিতে প্রশ্ন করে জানতে চাইলাম তুমি কেমন করে বুঝলে আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি ?
সে খুব আন্তরিকতা নিয়ে বলল ,তোমার আতিথেয়তা দেখে।
আমি ও লজ্জা পেলাম এবং বললাম ,এটা বেশি কিছু নয় !আমাদের দেশের সংস্কৃতি ই এমন অতিথি দেখলে সব মানুষ খুশি হয়।
তারপর তারা দুজনেই দুজনের পরিচিতি দিল। এক জনের নাম নাতালি নিশিউকি অন্য জনের নাম এমিলি সাইতো ।তারা দুজনেই খণ্ডকালীন খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারক। কাছের কিংডম হল থেকে এসেছে।সপ্তাহের দুই দিন তারা মানুষের বাসায় বাসায় ধর্ম প্রচারনার কাজে যায় । একটি ম্যাগাজিন আমার হাতে দিয়ে বলল ,তুমিও আসতে পারো ।পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানবিকতা নিয়ে অনেক বিষয় আছে তুমি পড়ে দেখতে পারো ।
আমি বললাম ,আমি মুসলিম । তবে আমি তোমার ম্যাগাজিন পড়বো । নিশি উকি বলল আমি আগেই বুঝতে পেরেছি তুমি উদার মুসলিম । ভাল মুসলিম ।
আমি একটু অবাক হলাম । ওকে জিজ্ঞেস করলাম ,তুমি কিভাবে বুঝলে আমি মুসলিম ?
নিশিউকি আমার রুমে রাখা জায়নামাজ দেখিয়ে বলল, আমি অনেক বছর আগে এই হক্কাইডো বিশ্ব বিদ্যালয়ের এক বাংলাদেশি মুসলিম পরিবার কে চিনতাম। তাদের সংস্কৃতি আমি দেখেছিলাম। শুধু তাই নয় আমি বাংলাদেশ নিয়ে নিজে নিজে ইন্টারনেট এ পড়াশুনা করে বাংলাদেশের যুদ্ধ ,ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্পর্কে জেনেছি।
আমার যেন নিশিউঁকি কে নিয়ে এক অদ্ভুত আগ্রহ তৈরি হল মনের মধ্যে ।জাপান একটি ধর্ম হীন দেশ । এখানে কাজের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিয়ম নীতি মেনে চলাই ধর্ম । এখানে আগে অনেকে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল । কিন্তু কেউ কেউ খ্রিস্টান ,ইসলাম ,কিংবা অন্য যে কোন ধর্মে ও ধর্মান্তরিত হয়েছে । তবে বেশিরভাগ মানুষ ধর্মহীন এবং স্বাধীন ।

এমন করেই শুরু হয় নিশিউঁকির সাথে আমার পরিচয় । প্রায় ছুটির দিন গুলোতে নিশিউঁকি আমার বাসায় আসে । কথা হয় দেশ ,জীবন সংস্কৃতি নিয়ে । প্রকৃত পক্ষে সে একজন কলেজ শিক্ষক । আমি তাকে বাংলাদেশি খিচুড়ি ,ইলিশ মাছ আর আলু ভর্তার সাথে পরিচিত করি । তবে সে সময় থেকে অনেক জাপানিজদের সাথে মিশে বুঝতে পেরে ছিলাম ওরা খাবার খুব আয়োজন করে খায় ।খুব উপভোগ করে । যে কয়দিন আমার বাসায় এসেছে সেই কয়দিন দেখেছি খাবার খাওয়ার আগে খুব সুন্দর করে প্রার্থনা করতে । এখন পৃথিবীতে অনেক ধর্মের অনেক ধার্মিক দেখা যায় । কিন্তু ধর্মের সৌন্দর্য শান্তি, বিশ্বাস ,ভালোবাসা যেন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে ।
সারা পৃথিবীতে ধর্ম কে কেন্দ্র করে যুদ্ধ সংস্কৃতি যেন বেড়েই চলছে । মানব পৃথিবীতে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ,শ্রদ্ধা মানবিকতা সত্যিই অসহায় । আমি নিজে মানুষের সঙ্গ পছন্দ করলেও কখনও কখনও কিছু কিছু সময় মিশ্র চিন্তার মানুষ কে এড়িয়ে থাকি । একজন ভয়ংকর মানুষের চেয়ে গভির নিরবতা এবং একাকীত্ব ও অনেক সুন্দর । যদিও এখনকার অস্থির সময়ের পৃথিবীতে ভাল এবং মন্দ বুঝাও অনেক কঠিন । নতুন যে কোন কিছু আমাকে আকর্ষণ করে । নতুন মানুষ ,নতুন সংস্কৃতি ,নতুন চিন্তা ভাবনা আমাকে আন্দোলিত করে । কয়েক মাস নিশিউঁকির সাথে আমার দেশ, সংস্কৃত ,ইতিহাস, ধর্ম এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ নিয়ে অনেক কিছু অনেক বিষয় নিয়ে কথা হয় ।একটা নির্ভেজাল সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠলো নিশিউঁকির সাথে আমার । কখনও আমাকে বাসায় না পেলে দরজায় হানি চকোলেট আর ধর্মীয় শান্তির বানী সম্বলিত ম্যাগাজিন ঝুলিয়ে দিয়ে
যায় । সেই সাথে কখনও কখনও ছোট ছোট চিরকুট ।সেখানে লেখা থাকে ভালোবাসা ,বন্ধুত্ব ,মানবিকতা নিয়ে দুই চার লাইন কবিতা ।আমি দিনে দিনে একটা শ্রদ্ধাবোধ অনুভব করি ।সে আমাকে তার ইমেইল ঠিকানা দেয়। আমি তাকে ফেসবুকের কথা এবং বন্ধুত্তের কথা বললাম ।সে প্রকাশিত পৃথিবীর একজন হতে নারাজ । নিভৃত পাহাড়ি জীবনই যেন তাদের বৈশিষ্ট্য। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম তার বাড়ি তেইনে পাহাড়ের মাঝে । সে পাহাড়ে আছে আরেক বসতি । আরেক জীবন সংস্কৃতি । আছে বিদ্যালয় ,হাসপাতাল ,বৃদ্ধাশ্রম ,পার্ক, বিনোদনের অনেক কিছু । আমি ওর মুখে শুনে অভিভূত হই । সেই তেইনে পাহাড়ে যাওয়ার জন্য আমার মন আনচান করতে লাগলো । আমি তাকে বুঝতে দিলাম না । তাকে বুঝানোর আগেই সে আমাকে দাওয়াত করলো তার সেই তেইনে পাহাড়ে ।কিন্তু তেইনে পাহাড়ে যেতে বাঁধা হল শীতকালীন তুষারপাত । আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম যে

নতুন কিছু জানতে মাঝে মাঝে ঝুঁকি নিতে হয় । আমি তার কাছে জানতে চাইলাম গাড়ি চালনায় তার দক্ষতা কেমন?
সে হাসল । সে লাজুক হাসির সাথে আত্মবিশ্বাস নিয়ে জানালো ,জাপানিজরা গাড়ি ভাল চালায় ।তুমি চাইলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি পরের কোন ছুটির দিনে ।আমি তার কাছ থেকে জেনে নিলাম বাসায় কে কে আছে । সে জানালো মা,বাবা,সে আর তার ছোট বোন । একটি ভাই আছে কিন্তু সে টোকিও তে থাকে পরিবার নিয়ে । নিশিউঁকির বয়স অনুমান করার চেষ্টা করে বুঝলাম হয়তো সে একা ।হোক্কাইডোতে অনেক অনেক একা মানুষ আছে । যারা বিয়ে করেনি।কিংবা বিয়ে হয়েছিল ।হয়ত মন ভাঙ্গা নিঃসঙ্গ মানুষ ।আমরা আমাদের সংস্কৃতিতে জীবন বলতে যা বুঝি ওদের কাছে জীবনের ছবি আরেক রঙে আঁকা । ওরা জীবন কে গভীর ভাবে উপলব্ধি করে ।তবে কাজের মধ্য দিয়ে ।

হেয়ালিপনা শব্দটা হয়তো জাপানিজ অভিধানে নেই । জাতিগত ভাবে সবাই সিরিয়াস ।তারপর এক শনিবার । আমি বাংলাদেশি প্রস্তুতি নিলাম । নিজের হাতে মিষ্টি ,পায়েস ,মুরগির রোস্ট আর বাদাম পোলাও রান্না করলাম । সেদিন তুষারপাত ছিলনা তবে হালকা শৈত্য প্রবাহ । চারিদিকে বরফে ঢাকা পথ। এই সময় গাড়ি চালনা অনেক বিপদ জনক ।জানিনা নিশিউঁকি কেন এত বেশি আন্তরিক হয়ে গেল আমার সাথে!আমার মনের মধ্যে আনন্দের সাথে একটু একটু ভয় ও কাজ করছিল । সে কথা মত সকাল নয়টায় চলে এলো । জাপান এ সকাল নয়টা কেমন সকাল না । কারন এখানে ভোর হয় অনেক আগে ।গাড়ি চলছে । কিতাকু ওয়ার্ড ছেড়ে হাচিকেন ,তারপর হাসসামু নামের একটা জায়গা। সেখান থেকেই দেখা যায় পাহাড় তেইনে ।আমি একটু স্বাভাবিক থাকার জন্য কথা শুরু করলাম ।

তোমার নিশিউঁকি নামের অর্থ কি ?
জাপানিজ নিশি অর্থ পশ্চিম আর উঁকি হল তুষার ।পুরো অর্থ পশ্চিমের তুষার ।
আমি মুগ্ধ হয়ে বললাম ,বাহ! খুব কাব্যিক অর্থ ।
সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো ,তোমার নামের অর্থ কি?
আমি বললাম ,নুরুন নাহার আরবি শব্দ নুরুন অর্থ হলি এবং নাহার অর্থ লাইট অফ দ্যা ডে ।
সে হেঁসে উঠল্।তারপর গাড়িটা সামনের ডান দিকে সামান্য বেঁকে একটু জোরে চালাতে চালাতে বলল,তুমি পাশে বসে আছো বলেই আজকের দিনটা বেশি উজ্জ্বল ।
আমি ও হেসে দিলাম । সে আমাকে বলল ,তোমার পরিচিত হয়ে আমার মন আরও অনেক বছর আগে ফিরে গেছে । কিন্তু আমি সত্যি ভীষণ খুশি । আমি কিছুই বললাম না । সে ই শুরু করল ।
ইউসুফ ছিল হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ । ক্যান্সার জীবাণু নিয়ে গবেষণা করতেই সে এখানে এসেছিল পাঁচ বছরের জন্য । আমি তখন ওর প্রফেসর এর অফিস সহকারী হিসাবে দুই বছরের জন্য নতুন চাকুরিতে ঢুকি । প্রতিদিন সে মধ্যাহ্ন ভোজ করার আগে একটি পুরনো জায়নামাজ বিছিয়ে যহুর নামাজ পড়ত । আমি তার নিয়ম করে নামাজ পরতে দেখে অভিভুত হই । আমি খুব মুগ্ধ হয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তার নামাজ পড়া দেখতাম ।জানি না কখন ইউসুফ এর জন্য আমার মন হারিয়ে গিয়ে ছিল । প্রায়ই বিষয়টা ইউসুফ বুঝে ফেলত এবং সামান্য হাসত । আমি একদিন টার্কিশ দোকান থেকে একটি জায়নামাজ কিনে আনি। ওর পুরনো জায়নামাজ সরিয়ে নতুন জায়নামাজ রাখি । আমি অপেক্ষা করতে থাকি একটি ধন্যবাদ পাওয়ার জন্য ।কিন্তু দুই সপ্তাহ চলে গেল । ইউসুফ কোন ধন্যবাদ দিল না । সে নির্বিকার ভাবে ওই জায়নামাজে নামাজ পড়ে যাচ্ছে ।
আমার মন অস্থির হল এবং ওর অনুভূতিতে ছুইয়ে দিতে একটা চিরকুটে লিখে দিলাম ,এই ম্যাট টা সুন্দর ।এটা কি বাংলাদেশি ?
তারপর দুই দিন পর । হঠাৎ একজন আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্র এসে বলল, ওই ম্যাট টা টার্কিশ ।ইউসুফ সান তোমাকে বলতে বলেছে । আমি বোকা হয়ে গেলাম । কিন্তু ইউসুফ এর সাথে আমার কেমন করে বন্ধুত্ব করব এই ভাবনা নিয়ে মাথায় সব সময় ঘুরপাক খেত ।একদিন প্রফেসর আরও একজন প্রফেসর কে ইউসুফ সম্পর্কে বলছিল যে তার মা ক্যান্সার এ আক্রান্ত । আমি বিষয় টা শুনি । আমার মন দুঃখিত হয় । আমি আর আগের মতো আচরন করিনা । নিজেকে সংযত করলাম । এভাবে প্রায় ছয়

মাস । হঠাৎ একদিন আমি ভীষণ মনোযোগ দিয়ে একটি অফিসিয়াল চিঠি টাইপ করছিলাম । বুঝলাম কেউ আমার সামনে । ইউসুফ আমার সামনে । হাসোজ্জল মুখে সে বলল ,আমি বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাসা পেয়েছি । আগামি সপ্তাহে ল্যাব এর সবাইকে নৈশ ভোজ এর দাওয়াত করেছি । তুমি ও আসলে খুশি হবো ।
ইউসুফের দাওয়াত আমাকে আনন্দে ভাসিয়ে দিল । এই কয়দিন আমি যে কষ্ট পাচ্ছিলাম সব ভুলে গেলাম ।

খুব মনোযোগ সহকারে নিশিউঁকি অতিত বর্ণনা করছিল । আর গাড়ি চালাচ্ছিল । আমি শুনে যাচ্ছিলাম । সে আমার নিরবতা দেখে জিজ্ঞেস করল,তুমি অবাক হচ্ছো ?
আমি বললাম ,কিছুটা ! তবে এটা আমার চিন্তার মধ্যে ছিলনা । কারন আমি এখানে তেমন বাংলাদেশি দেখিনি ।
ততক্ষণে আমরা তেইনে পাহাড়ের মাঝে চলে আসছি । সে এক বিশাল আয়োজন । মাত্র তিন জন মানুষের জন্য এতো কিছু । জাপানিজ আতিথেয়তা নিয়ে অনেক বদনাম আছে । ওরা সময়ের অভাবে কাউকে বাসায় দাওয়াত করে না । রেস্টুরেন্ট এ খাওয়ার পর যার যার বিল সে সে দেয় । কিন্তু ওদের আতিথেয়তা দেখে আমার ভিতরে প্রচলিত ধারনা ভেঙ্গে গেল । তেইনে পাহাড়ের মাঝে তিন তলা বাড়ি । দুতলায় ওর মা বাবার সাথে দেখা করলাম । নিচ তলায় এমিলি ,আমি আর নিশিউঁকি বিশাল অতিথি রুমে পুরনো ঐতিহ্যবাহী টেবিলে নিচে বসে মধ্যাহ্ন ভোজ করলাম । সামুদ্রিক খাবার হিজিকি,কিসুই, গবো নামের এক খাবারের সাথে চিকেন ফ্রাই ,অনেক রকমের ফলের ডেসার্ট ,আর সাকুরা সুপ টা আমাকে বেশি মুগ্ধ করল । আমার খাবার গুলো ওর মা টেবিলে রেখে ছবি তুলল কারন টোকিও তে তাঁর ছেলে কে দেখাবে ।

যথারীতি নিশিউঁকির পরিবারের সবাইকে এবং এমিলি কে বিদায় জানিয়ে আমি গাড়িতে উঠলাম বাসায় ফিরব বলে । তেইনে পাহাড় এর বরফ কেটে গাড়ি নিচে নামছিল । আমি আমার ভিতরের কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারছিলাম না । অনেকটা পথ নিচে নামার পর আমি প্রশ্ন করলাম ,তারপর কি হয়েছিল ?
সে আমার দিকে তাকাল না । সামনে চোখ রেখেই স্বাভাবিক ভাবে বলল ,পরের দুই তিন বছর একটা সুন্দর বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক ছিল আমাদের মধ্যে । যেখানে গভীর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা বোধ ও ছিল । কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ধর্ম বাধা হয়ে দাঁড়ালো । আমার তরফ থেকে না থাকলেও ইউসুফ এর মা মানতে পারছিল না আমাকে ।
অনেকক্ষণ সে কোন কথা বলল না । ও হয়তো আবেগ প্রবন হয়ে গেছে ।আমিও চুপচাপ রইলাম । বাইরে সূর্যের ম্লান হাসি । একটু শৈত্য প্রবাহের ছোঁয়া অনুভব করলাম । বাইরে তাকালে চারিদিকে বরফে ঢাকা সাদা পৃথিবী । আমার দুচোখ পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলো ।গাড়ি নতুন বাঁক নিল পুরনো পথে কিতাকু ওয়ার্ডের দিকে ।
সে আবার নিজ থেকেই বলল ,মৃত্যু নিশ্চিত ক্যান্সারে আক্রান্ত মায়ের কথা চিন্তা করে ইউসুফ ধর্ম কে সামনে রেখে তার সব ভালোবাসা আর অনুভুতি পৃথিবীর কোন গোপন যায়গায় লুকিয়ে রাখলো ।কোন অভিযোগ
নেই । মানুষের মধ্যে যিনি এই ভালোবাসা নামক অনুভুতি তৈরি করেছেন এবং মানুষের জীবন সুশৃঙ্খলপূর্ণ রাখতে ধর্ম নামক যে বিধান দিয়েছেন তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ।আমি সেই অনুভুতিকে সম্মান জানিয়ে আমৃত্যু মানুষ কে ভালোবেসে এবং ঈশ্বরের সেবা করে যেতে চাই। পৃথিবীর সকল মানুষের জীবন শান্তিময় হোক ।
আমি মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছিলাম । এর মধ্যেই গাড়ি আমার বাসার সামনে এসে ধামলো ।বাইরে বের হয়ে তাকে ধন্যবাদ দিলাম । সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল এবং ইশারা করে বিদায় জানাল ।
নিশিউঁকি ওর গাড়ি নিয়ে চলে গেল ।কিন্তু ওর নিরব দুটো চোখ আমাকে বেঁচে থাকার আরেক নিঃশব্দ জীবনবোধের গল্প বলে গেল ।

???? ?? ???? ????????

শাহরিয়ার সকালে নামাজ শেষ করেই বেরিয়ে পড়লো।কিছু খেতে একদমই ইচ্ছে করছিলো না।সিড়ি থেকে নামতেই পাশের বাড়ির শুভ্রার সাথে দেখা হলো।

– কি শাহরিয়ার ভাই , আর দেরী করতে পারছেন না বুঝি! প্রণয়ীনীর সাথে সাক্ষাতে চললেন!

শাহরিয়ার কোন উত্তর দিলো না।

– আরে!! রাগ করলেন নাকি!

শাহরিয়ার গাড়ি নিয়ে থামালো একটা ফুলের দোকানের সামনে।এক গুচ্ছ সাদা গোলাপ নিয়ে নিলো।আজ ঈদের দিন।তাই আর সবার মতো তার কাছেও এই দিনটির অনুভূতি বিশেষ , যদিও কারণটা ভিন্ন।সাত বছর আগে এই ঈদের দিনেই তার মা পৃথিবীর বুক থেকে চিরবিদায় নিয়েছিলেন।বছরের অন্য সব দিনগুলোতে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেও , এই দিনটিতে শাহরিয়ার নিজেকে সংবরণ করতে পারে না।ছুটে যায় মায়ের কবরে।মা সাদা গোলাপ খুব ভালবাসতেন।তাই সাদা গোলাপ কিনতে কখনো ভুল হয় না তার।

মা আর ছেলের ছোট সংসারে সাবিনা আহমেদ ছিলেন সবসময়ই একা।যদিও, শিক্ষকতা পেশার কারণে তার একাকীত্ব কিছুটা কম ছিল।কিন্ত চোখের ছানি অপারেশনের সময় চাকরিটা ছাড়তে হয়েছে তাকে।তাছাড়া এখন বয়সের ভারে ক্লান্ত শরীরটা আগের মতন শক্তি জোগাতে পারে না।তাই বেলকনিতে রাখা বেতের চেয়ার আর ধোঁয়া ওঠা কফির মগ তার অলস বিকেলের সঙ্গী।ব্যস্ত নগরীর জীবনে মায়ের জন্য ছুটির দিনগুলোতেও সময় থাকতো না শাহরিয়ারের।কাজ শেষে কখন ছেলে আসবে, সেই অপেক্ষায় জেগে থাকতো মায়ের মায়াভরা নয়ন দুটি।দিনশেষে জমে থাকতো অনেক কথা।শাহরিয়ার বাড়ি ফিরতেই বলতেন,

– বাবা, আয় খেয়ে নে।অনেক রাত হয়েছে।

– মা তুমি কেন জেগে থাকো এত রাত পর্যন্ত? তাছাড়া ঘরের একটা চাবি আমার কাছে থাকে।এখন খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।আমার কিছু কাজ আছে, আমি পরে খেয়ে নেব।

তারপর ল্যাপটপ নিয়ে পড়ে থাকতো নিজের রুমে।মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছিলো ছেলের ওমন অবজ্ঞায়! যদিও হৃদয়ের মাঝে যে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিলো তা সে বুঝতে দিলো না।এভাবেই হঠাৎ কোন একদিন এক বুক কষ্ট নিয়ে বিদায় নিলো মায়ার এই ভুবন

থেকে।আজ শাহরিয়ারের ফেরার অপেক্ষায় আর কেউ পথ চেয়ে থাকে না।

প্রতিটি মুর্হূতে শাহরিয়ার স্মরণ করে তার স্নেহময়ী মায়ের কথা।শুনতে ইচ্ছে করে সেই আদর মাখা শাসনগুলো।মায়ের মতো সেও আজ হাজার মানুষের ভিড়ে একা ; শূন্যতার এই শহরে।

" মা " ছোট্ট একটি শব্দ। এই ছোট্ট শব্দটির সাথে জড়িয়ে আছে সবচেয়ে বিশালতম অনুভূতি।এক বুক ভালবাসা আর স্নেহ নিয়ে সবসময় যে ছায়ার মতো আমাদের পাশে থাকেন ; সে শুধুই মা।মায়ের অকৃত্রিম মমতার সাথে আর কারো তুলনা হয় না।বতর্মান সময়ে আমরা সবসময় ব্যস্ত থাকি অথবা নিজেকে ব্যস্ত রাখি।এর মাঝে নিজের সবচেয়ে কাছের যে মানুষ -" মা ", তাকে নিয়ে ভাবি কতটা সময়! অথচ আমরা যখন সর্বপ্রথম পৃথিবীর সোনালী আলো দেখছি ; ঠিক তখন থেকেই আমাদের মায়ের সমগ্র জীবনটাই ছিলো আমাদের ঘিরে।প্রযুক্তি আমাদের জীবনে দিয়েছে আধুনিকতার ছোয়া।তবে কেড়ে নিয়েছে সময়গুলোকে।কখনো কি ভেবে দেখেছেন! তাই মায়ের জন্য কোন কিছু করতে কোন বিশেষ দিনের অপেক্ষায় বসে থাকবেন না।কারণ, আপনার কিছু করবার প্রয়াসই হয়ত সেই দিনটিকে বিশেষ করে তুলতে পারে।না, মা দিবসের কারণে এই লেখাটা লিখছি না।বরং, এটি আপনার ঘুমন্ত সত্তাকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে লেখা।

তা না হলে, শাহরিয়ারের মতো আপনিও হারিয়ে ফেলবেন এই স্বর্গ-সুখটিকে।শুধু ভালবাসা নয়, সেই সাথে সঙ্গ দিন ভালবাসার এই মানুষটিকে।

সারা ভুবনের স্বর্গ – সুখ যেন

দেখিতে পায় মোর আঁখি,

যখন তোমার কোলেতে মাগো –

এলিয়ে মোর দেহটি রাখি।

?????? ???????

ইলিশ মাছটা কাটতে গিয়ে হাত কাটলো পায়েলের।পাশ থেকে শাশুড়ির ফোঁড়ন ,

– ধৈর্য্য বলতে কি কিছু নেই তোমার , পায়েল! সব কিছুতেই তাড়াহুড়ো।

– আম্মা ইচ্ছে করে হয়নি , হাত পিছলে গেছে।

– কই আমাদের তো এতো হাত পিছলায় না।

পায়েল কথা বাড়ালো না।গত রাতে পায়েলের বর অর্ক শখ করে দুটো ইলিশ মাছ এনে মাকে বললো ,

– কাল ইলিশ পোলাও করো তো মা , অনেকদিন খাওয়া হয় না।

পরক্ষণেই সালেহা খাতুনের স্পষ্ট জবাব ,

– ওসব বায়না এখন তোমার বউয়ের কাছে করো গিয়ে।আমি এখন শুধু আল্লাহ্ -রাসূলের নাম নিয়ে যে কটা দিন আছি বাঁচতে চাই।

তাই পায়েল সকালে নাস্তার ঝামেলাটা সেরেই মাছ কাটতে বসে গেছে।সালেহা খাতুন রান্নার কথায় এড়িয়ে গেলেও , পায়েলকে রাঁধতে দেখলে দুদন্ড শান্তিতে বসে থাকতে পারেন না নিজের ঘরে।প্রায়ই রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পায়েলের কাজ তদারকি করেন।

আর , পায়েল রান্নার বিষয়ে তেমন পারদর্শী না হওয়ায় শাশুড়ির ওসব কটুবাক্য সহ্য করে।

রান্নাশেষে পায়েল এক গ্লাস লেবুর শরবত বানিয়ে , তাতে দুটো আইসকিউব দেবার সাথে সাথেই শাশুড়ি মা গ্লাসে একটা চুমুক দিলেন।

– খুব ভালো করেছো। যা গরম পড়েছে না ! লেবু কি দু-টকরো দিয়েছো নাকি ? একটু বেশী টক লাগছিলো !

এক গ্লাস শরবত বানাতে দুমিনিটের মতো সময় লাগলেও তৃষ্ণার্ত পায়েলের আর তা ইচ্ছে হচ্ছিলো না।মোবাইলটা হাতে নিয়ে গা এলিয়ে দিলো বিছানায়।অনেকদিন হলো ফেইসবুকে বসা হয় না তার।তবে লগইন করে বুঝতে পারলো সেটা আসলে অনেক দিন নয় ,মাস হবে।কিন্ত বিয়ের আগে তো এমন ছিল না।মাত্র দেড় বছর হয়েছে সংসার শুরু করেছে পায়েল – অর্ক।অথচ, অর্কের টাইম-লাইন দেখে মনে হচ্ছে না ফেইসবুকে তার অনুপস্থিতির পরিমাণ পায়েলের মতো।

সময় পেলেও সে ফেইসবুকে বসে না আলসেমি করে – হয়ত এই বলে নিজেকেই স্বান্তোনা দিয়ে চুপ করালো পায়েল। বন্ধুদের বিয়ের পর বিভিন্ন দেশে ঘোরাঘুরির বর্ণিল ছবিগুলো দেখে পায়েলের মুখটা ম্লান হয়ে গেল।পায়েলের সহপাঠী শীলা চার -পাঁচটি প্রণয়ের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বিয়ে করেছে তাপসকে।এখন তাকে মনে হচ্ছে স্বামি নিয়ে বেশ সুখেই আছে।পায়েল ওদের সিঙ্গাপুরের ছবিগুলো দেখছিলো।

বাবা – মায়ের পছন্দে বিয়ে করেছে পায়েল।বিয়ের পর অর্কের বাবার হার্টের সার্জারি আর পরবর্তীতে, কাজের চাপের কারণে আজও কোথাও যাওয়া হয়নি ওদের।

অথচ, যে শীলার ছবি দেখে পায়েল একথা ভাবছিলো তার জীবনেও কি ছিল শান্তির অস্তিত্ব !

শীলার বর মালয়শিয়াতে ছোট একটা চাকরি করছে এখন।এদিকে বেচারি শ্বশুড়বাড়ির অত্যাচারে থাকতে না পেরে বাবার বাড়িতেই থাকছে আজকাল।স্বামি, তনয়ের কথা খুব মনে পড়ছিলো।তাই একবছর আগের ছবিগুলো আপলোড দিচ্ছিলো মাত্র।

উপরের এই ছোট গল্পটি কাল্পনিক হলেও ; আমাদের জীবনেও এমন অনেক ঘটনা ঘটে।সকালের এক কাপ চা থেকে শুরু করে, অলস দুপুরে কিংবা কাজ শেষে বাড়ি ফিরে আমরা নিজেরাই সঙ্গীরূপে বেছে নিচ্ছি ফেইসবুককে।প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে এর ব্যবহারকারীদের সংখ্যা।প্রযুক্তির এই অবদানে আমরা যদিও দূরের জিনিসকে কাছে পেতে সমর্থ হয়েছি, কিন্ত কাছের মানুষগুলোকে কি হারাতে বসেছি ! কখনো ভেবে দেখেছেন কি? আবার, কখনো এই ফেইসবুকই হয়ত পরোক্ষভাবে অবসাদ আনে আমাদের জীবনে।কিন্ত কেন ? এটাই তো ভাবছেন।

এখানে প্রত্যেকটি মানুষ ইচ্ছা অনুযায়ী তার নিজস্ব জগতটাকে আপনার সামনে উপস্হাপন করতে পারে।সেটা হতে পারে সত্য, অথবা তার কোন অপূর্ণ আকাঙ্খা (ফ্যান্টাসিও বলতে পারেন) অথবা, পুরোটাই বানোয়াট – ফেইসবুকের ভাষায় যাকে আমরা ফেইক বলি।কেউ নিজের ব্যর্থতা বা গ্লানির গল্প সুবিন্যস্ত ভাবে সাজিয়ে এখানে উপস্হাপন করে না।অথচ দেখুন, আমরা নিজেরা যাকে “ভার্চুয়াল ওয়াল্ড ” বলি, সেখানকার অনেক কিছুকেই খামোখা সত্য মেনে হতাশায় ভুগে থাকি।কি পায়নি আর কেন পায় নি এই ভেবে, আগামী দিনগুলো দুর্বিষহ করে তুলবেন ; নাকি কতটা ভাল আছি এবং আমার সাথে এরচেয়েও খারাপ কিছু ঘটতে পারতো – এই ভেবে জীবনটা উপভোগ করবেন, সে সিধান্তটা একান্তই আপনার।তাই, অবসরের সুখটুকু ফেইসবুকের মাঝে খুঁজে না বেরিয়ে ; আপনার কাছের মানুষগুলোর জন্য বরাদ্দ রাখুন

?????? ??????

আমি তখন ছায়ানটের রবীন্দ্র সংগীত এর ছাত্রী ছিলাম। ও নাকি চুপি চুপি আমার সব গানের অনুষ্ঠান গুলো দেখত । যদিও এ বিষয় গুলো বিয়ের পর একটু একটু করে জেনে ছিলাম। জীবনের সুন্দর সময় গুলো চোখের পলকে শেষ হয়ে যাবে ভাবিনি কখনো ।কোন দিন ভুল করে কল্পনা ও করিনি।
ও নাকি আমার উচু নাক আর নাকের সাদা ছোট ডায়ামণ্ড এর নাক ফুল টা খুব পছন্দ করত।বলতো বাঙালি মেয়েদের এ সুন্দর ব্যাপারটা ও কে খুব আকর্ষণ করে । আর তাই নাকি আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগত। কাঁচের চুরির শব্দ নাকি ও কে খুব আন্দোলিত করতো ।কাঁচের চুরির শব্দ নাকি ওকে ক্লান্ত মনে ছন্দ এনে দিত। তাই বিয়ের পর প্রতি মাসে বেতন পেলেই আমার জন্য কাঁচের চুরি নিয়ে আসতো।

মেয়েদের গাড়ো করে কাজল দেয়াটাও ওর ভাল লাগা ছিল । সারাদিন কাজের শেষে আমার গভীর কাজল চোখ নাকি ওকে শান্তি

দিতো ।
মেয়েদের গভীর কাজল চোখ নাকি ছেলেদের প্রশান্তময় রাখে ।অনেক ভুল থেকে দূরে রাখে। স্বপ্নময় করে রাখে।
আমি ওর জন্য প্রতিদিন কাজল পরতাম। বিয়ের পর আমাদের প্রতিটি দিন ছিল ভালবাসার কবিতার মতো । সত্যিই আমার সে জীবন টা হয়তো স্বপ্ন কে ছাড়িয়া যায় ।
আমার পঙ্গু জীবনে একটা স্বপ্ন ছিল ।যে স্বপ্নের কাছে কোন দুঃখ ছিল না । ২০০১ এর ১৪ এপ্রিল রমনা দুর্ঘটনা তে আমি পঙ্গু হয়েছিলাম । নিজের জীবন টা কে অনাকাঙ্ক্ষিত মনে হতো ।পরিবারের সবাই আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতো ।আত্মীয় স্বজন এ সমাজ আমাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখত ।
বিবাহিত বড় ভাইয়ের উপর সংসারটা টানাপোড়নে চলছিল । বাবা ছিল অবসর প্রাপ্ত । বড় অসহায় একজন মানুষ । আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে এবং আমার চিকিৎসার জন্য অনেক খরচ বহন করতে হয় । কে এত সব করবে? মায়ের রাতে ঘুম হতোনা । চারপাশের লোকজন অনেক রকম কথা বলতো ।
আমার মন সব সময় খারাপ থাকতো ।আমি জীবনের নানা প্রশ্নের উত্তর খুজতে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম । আমার অসহায় জীবনের নানা অব্যক্ত কথা গুলো আকাশে উড়িয়ে দিতাম । ওর ছোট বোন ছিল আমার আমার গানের ছাত্রী । ওই নাকি গান শিখতে আমার কাছে পাঠিয়ে ছিল ।
ওর বোনের নাম অদিতি। ও তখন ক্লাস নাইন এর ছাত্রী ।অদিতি প্রতিদিন আমার ভাল লাগা মন্দ লাগা শুনত ।আর অদিতির কাছ থেকেই ও আমার খবর নিত ।

এভাবেই নিতি কথা গুলো বলছিল । আমি ও নিতি কে চিনি না । মাঝে মাঝে আমি আর আম্মা রমনা পার্কে বিকেলের হাওয়া খেতে বের হতাম। নিতি কে দেখতাম হুইল চেয়ার এ করে একটি জায়গায় বসে বসে কি যেন দেখত। আমার আম্মা বলত দেখ কি সুন্দর একটা মেয়ে হুইল চেয়ার এ বসে আছে ।
মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমার ও কেমন যেন মায়া লাগত । একটা জানার আগ্রহ মনের মধ্যে তৈরি হল ।একদিন বিকেলে মেয়েটির কাছে গেলাম ।নিজ থেকেই পরিচিত হলাম ।এমন করে মাঝে মাঝেই টুক টাক কথা হত ।অনেক ধরনের গল্প হতো। সমাজ, সংস্কৃতি ,দেশ নিয়ে তার অনেক পড়াশুনা আছে । আমার খুব ভাল লাগত । দুই একদিন রবীন্দ্র সঙ্গীত এ আনন্দময় হয়ে উঠতো আমদের বিকেলটা । সেদিনের বিকেলটাও এমনি ছিল । হুইল চেয়ার এ করে একটি মেয়ে এগিয়ে যেত আর আমি তার পাশে পাশে হাটতাম । রমনার সেই জায়গাটা তে এসে নিতি সেদিন নিজেকে প্রথম বারের মত প্রকাশ করল । আমি অবাক আর বিস্ময় নিয়ে নিতির বেঁচে থাকার গল্প শুনছিলাম । যে রমনার বটমূলে নিতির সুন্দর জীবনের পথ টা অন্ধকার দিকে বেকে গেছে সে জায়গাটা নিতি ভুলতে পারে না । এখানে এসেই জীবন কে খুঁজে ফিরে । নিতি বলে যেতে লাগলো ।
একটি সাধারন বিয়ের ঘটনার মতই দীপ্ত আমাদের বাসায় প্রস্তাব পাঠাল । আমদের দুই পরিবারে কোন সমস্যা ছিল না । কিন্তু এ সমাজ দীপ্ত কে নানা ভাবে বিব্রত করত পঙ্গু স্ত্রী কে নিয়ে কেমন আছে এ সব বলে । সব কিছুকে তোয়াক্কা না করে দীপ্ত আমাকে সমান্তরাল ভালবেসে গেছে । আমার প্রতি দীপ্তর সীমাহীন ভালবাসার কাছে এ সমাজের সব অদ্ভুত প্রশ্ন আটকে গেছে ।সব অযৌক্তিক কৌতুহল এক বিবেকের কাছে এসে বিনীত হয়েছে।

ও তথাকথিত সমাজের প্রচলিত ধারনাকে ভেঙ্গে দিয়ে আমাকে নতুন জীবন দিয়েছিল । আমি আমার পঙ্গু জীবন কে ভুলে গিয়েছিলাম । অদ্ভুত ছিল ওর ভালোবাসা ! ২০১১ এর এগার নভেম্বর রাত এগারোটা । পুরো পৃথিবী যেন এক সময়ে বাঁধা ।আমদের বিয়ের নয় বছর পূরণ হল ।ও আমাকে এগারটি লাল গোলাপ আর এগারো রঙের এগারো সেট কাঁচের চুড়ি উপহার দিয়ে অবাক করে দিল । আমার ছেলের বয়স তখন আট । আমি যেন ওর কাছে সব সময়ই নতুন ছিলাম ।ও নতুন নতুন ভাবে আমাকে ভালবাসা প্রকাশ করতো । কিন্তু জীবনের গল্পটা আবার পাল্টে গেলো । ২০১২ এর ২০ ফেব্রুয়ারি ।পরের দিন ভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি । অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা । ও ব্যাংকে চাকুরী করতো । প্রতিদিনের মতো বাসায় ফিরছিল

। একটা ট্রাক ওর গাড়ী চুরমার করে পালিয়ে গেলো । একটি পঙ্গু অসহায় মেয়ে সারা জীবনের জন্য আবার ও পঙ্গু হল । আমার বেঁচে থাকার জায়গাটা শূন্য হয়ে গেলো । আমাকে আর কেউ কোন দিন এগারটা গোলাপ এনে দিবে না । রবীন্দ্র সংগীত শুনতে চাইবে না। নতুন করে বেচে থাকার স্বপ্ন দেখাবে না । কেউ না ! নিতি কান্না জড়িত কণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করলো ...বলতে পারেন যে জন্য আমি পা হারিয়ে ছিলাম ,যে দুর্ঘটনা আমার স্বামী কে কেড়ে নিলো আমরা কতো টুকু দায়ী ? কবে এ অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা গুলো শেষ হবে ? নিতি কাঁদতে থাকল । ওর হাউ মাউ কান্নার শব্দ যেন আমার ভিতরটাকে ভেঙে দিচ্ছিল ।কয়েক ফোঁটা চোখের জল আমাকেও ভিজিয়ে দিল ।
নিতির প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নাই ।
তবে নিজ মা মাটি আর দেশ নিয়ে গভীর দুঃখ বোধ তৈরি হল । কখন যে নিতি হুইল চেয়ার এ করে অনেক দূরে চলে গেছে টেরই পায়নি । আমি আর পিছন থেকে ওকে ডাকলাম না। তবে খুব ইচেছ করছিল একবার বলি আমিই আপনাকে প্রতিদিন এগারটা করে গোলাপ দিব ।

কারণ একজন মানুষ হিসাবে কিছু না করতে পারাটা ওকে আর ডাকতে দিল না ।আমার ভেতরেও একটা ব্যর্থ হৃদয় চূরমার হতে লাগলো।

আমিও আর পিছনে তাকাতে পারলাম না ।কিংবা ওর দিকে তাকানোর সব শক্তি হারিয়ে ফেলে ছিলাম।

?????

রাতের প্রায় আড়াইটা বাজছে। দোতালার শোবার ঘরে বসে টিভি দেখছিলাম। অবশ্যি এই সময়টাতে টিভিতে কিছুই দেখায়না। তারপরেও ইজিচেয়ারে বসে দুলতে দুলতে চ্যানেল পাল্টাচ্ছি কারণ লোকাল চ্যানেলগুলোতে বারবার দেখাচ্ছে যে শহরের জেলখানা থেকে এক ভয়ঙ্কর খুনী পালিয়েছে। টিভিতে খুনির ছবিও দেখাচ্ছে। ফোন করে কেউ পুলিশে খবর দিয়েছে যে তাকে দেখা গেছে এই আবাসিক এলাকায়। গা শিউরে ওঠার মতো খবর।

ক্যাঁররররচচচ!

চমকে উঠলাম আমি! নিচতলার সদর দরজাটা খুলে ফেলেছে কেউ। মরচে ধরেছে কলকব্জায়, যতই আস্তেই খোলা হোক না কেন, আওয়াজ পাওয়া যাবেই।

টিভিটা বন্ধ করে দিলাম। ঘরটাতে খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো আসছে। আবছা আলোয় পথ দেখে এগিয়ে গেলাম দরজার সামনে। নিচ তলায় পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি। কেউ ঘুরে ঘুরে দেখছে বাড়িটা। ভয় পেলে মানুষের শিরদাঁড়া বেয়ে কি যেন নেমে যায় জানেনই তো, আমিও তাই অনুভব করলাম।

নাহ, মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। ওপরে আসার আগেই আমার পালাতে হবে। নিজের জীবন বাঁচাতে হবে আমাকে।

খোলা জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম। শাদা মোটা একটা পাইপ নেমে গেছে ওপর থেকে নিচে। জানালা দিয়ে বের হয়ে হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরলাম পাইপটা। নামতে শুরু করলাম। পাইপটার চারদিনে কি সুন্দর আইভিলতা প্যাঁচানো ছিলো। দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে বোধহয়। ধুর ছাই! জাহান্নামে যাক আইভিলতা।

পাইপ বেয়ে পিছলে পিছলে আধ মিনিটেই নিচে নেমে এলাম। যাক বাবা! বাঁচা গেলো। মহাকর্ষ না অভিকর্ষ, কি যেন একটা আছে না? সেটাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না।

দৌড়োতে শুরু করলাম। পেছন থেকে গুম গুম আওয়াজ আসছে। এত সহজ না বাছাধন। ওক কাঠের পেল্লায় দরজা ভাঙ্গার আগেই আমি নিরাপদ জায়গায় চলে যাবো!

বেশ খানিকটা পথ দৌড়ে এসেছি। দূর থেকে দেখছি শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরে ঢুকেছে অবশেষে!

খিক খিক করে হাসছি আমি। কি মজাটাই না হচ্ছে এখন সেখানে!

ঘরে এখন পুলিশ ঢুকেছে। আমিই ওদের ফোন করেছিলাম!

শোবার ঘরে ঢুকে যখন পুলিশ ব্যাটারা দেখবে বিছানায় গলাকাটা দুটো লাশ, লালচেকালচে রক্ত থইথই করছে ঘরময়, কি মজাটাই না হবে!

সামনে আমার এখন আরেকটা বাড়ি। রক্তাক্ত ধারালো ছুড়িটা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি সেদিকে। হাসিমুখে, নতুন শিকারের খোঁজে।

(বিদেশী গল্প অবলম্বনে)

??? ??????? ????

অনেকটা সময় ধরে নাদিয়া বৃষ্টিতে ভিজছে।বাড়িতে ফেরার সাথে সাথে আজ বৃষ্টি শুরু হয়েছে।ক'দিন ধরেই তার মনটাও যেন অপেক্ষায় ছিল, এই বৃষ্টিটার জন্য।তাই, আর কি দেরী করা যায়! মা টের পাবার আগেই এক দৌড়ে ছাদে চলে গেল নাদিয়া।এর আগেও বহু বার লুকিয়ে এভাবে বৃষ্টিতে ভিজেছে সে।তবে আজকের রাতটার অনুভূতি একটু আলাদা। তবে, সে কারণ সে বুঝতে পারছে না এখনো।বহু বছরের ক্লান্ত মনটা যেন প্রশান্ত হলো আজ।

-"আরে নাদিয়া! জ্বর বাঁধিয়ে ফেলবে তো তুমি! এখন বাড়ি যাও, ভাই।"

নাদিয়ে পেছন ফিরে তাকালো।

-" হুম বুঝেছি, আমাকে তাড়িয়ে আপনি ভাবির সাথে বৃষ্টিটা উপভোগ করতে চাইছেন।"

-"না ভাই, আমাদের কি আর সেই সময় আছে। তোমার ভাবির কটা কাপড় ছিল ছাদে, ওগুলোই নিতে এসেছিলাম। "

রাসেল নাদিয়াদের ওপর তলায় থাকে।রাসেলের স্ত্রী মিথিলার সাথে নাদিয়ার খুব ভাল বন্ধুত্ব।তবে রাসেলের সাথে তার তেমন একটা দেখা হয় না।

কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থেমে গেল।নাদিয়া বাড়িতে ঢুকে দেখলো,তার বাবা গভীর মনোযোগের সাথে খবর দেখছেন।এই খবরটা শেষ হলে, আবার চ্যানেল পাল্টে অন্য খবর দেখবেন মতিন সাহেব।এভাবেই তার আগামী কয়েকঘন্টা চলতে থাকবে।নাদিয়া হাতমুখ ধুয়েই খাবার টেবিলে বসে পড়লো।আজ দুপুরে তেমন কিছু খাওয়া হয়নি।তাই খুব খিদে পেয়েছে তার।খাওয়া শেষে পাশের রুমে উঁকি দিয়ে দেখে নিলো মা একটা বই পড়ছে।

এবার নাদিয়া তার নিজের রুমে এলো।টেবিলে রাখা গল্পের বইগুলোর দিকে চোখ পড়লো তার।ধূলো জমেছে বইগুলোতে।একটা সময় এই গল্পের বই পড়ার নেশায় মেতে থাকতো সে।অথচ শেষ কোন বইটা পড়েছিল আজ তাও মনে পড়ছে না! একসময় বন্ধুদের আড্ডায় বসার ঘরটা বিকেলে জমজমাট ছিলো।আর এখন! কোন বিশেষ দিন ছাড়া কারো সাথে ফোনে কথাও হয় না তার।এভাবে কোথায় যেন জীবনের সব সুরগুলো হারিয়ে যাচ্ছে ! হারিয়ে গেছে নাকি সে নিজেই হারিয়ে যেতে দিয়েছে!

মাঝে মাঝে রাতে চিলেকোঠার ঘরটায় নাদিয়া রাতের বেলায় ঘুমোতে যেত।বিশেষ করে বৃষ্টির রাতগুলোতে।টিনের চালে বৃষ্টির ঝিরিঝিরি গুনগুন শুনার জন্যে কান পেতে থাকতো তার মনটা।তা যদিও অনেক বছর আগের কথা।হঠাৎ, আজ এমনটা একাকি সময় কাটাতে ইচ্ছে করেছে তার।দরজার কাছে যেতেই, নাদিয়ার বাবা এগিয়ে এলো

-' কি রে, কোথায় যাচ্ছিস এই রাতে হুট করে? '

– ' আজ একটু চিলেকোঠার ঘরটায় যাই বাবা,খুব ইচ্ছে করছে? '

-' যাবি,আচ্ছা।কিন্ত ওটা তো পরিষ্কার করে নিতে হবে।জরির মাকে সঙ্গে নিয়ে যা।'

-' কিন্ত মা....? '

-‘ সে আপাতত ব্যস্ত আছে।তাড়াতাড়ি যা তোরা, বাকিটা আমি দেখছি। ‘

রাতে ঘুমোতে যাবার আগে নাদিয়া একাকি পায়চারি করছিলো।নাদিয়ার বাবা কিছুক্ষণ পর মেয়েকে দেখতে এলেন।

-‘ একা থাকতে পারবি তো? ‘

-‘ বাবা এমনটা আজ প্রথম দেখছো! ‘

– ‘না, অনেকদিন পর তো। তাই ভাবলাম…’

-‘মা কি করছে? ‘

– ‘ ঘুমিয়ে পড়ছে। আর শোন, তুই বেশি রাত জাগিস না। ‘

-‘আচ্ছা। ‘

খুব সকালে নাদিয়ার ঘুম ভাঙ্গলো।মেঘে ঢাকা পুরো আকাশটা।চারপাশটা যেন শান্ত নিরুত্তাপ।এমন সুন্দর একটা দিনে কি ঘরে বসে থাকা যায়! নাদিয়া ঠিক করলো, আজ সারাটাদিন ঘুরে বেড়াবে এদিক-সেদিক।অবশ্য কাউকে চাইলে সাথে নেওয়া যেতে পারে।থাক না, সকাল সকাল কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।তাছাড়া, একা কোথাও গেলে প্রকৃতির সাথে নীবিড়ভাবে কিছু সময় উপভোগ করা যায়।কেউ সাথে থাকলে সে সুযোগ কোথায়!

বাড়িতে ঘুকেই নাদিয়া দেখে পলি ফুপু একরাশ বিরক্তি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

-‘ কোথায় ছিলি? ‘

-‘ কখন এসেছো ফুপু? ‘

-‘এটা কি আমার প্রশ্নের উত্তর, নাদিয়া!দাদা মেয়েকে চিলেকোঠায় ঘুমাতে দিচ্ছো, বাহ্! এমন মেয়েকে কে বিয়ে করবে শুনি? ‘

-‘ আজব তো! চিলেকোঠায় ঘুমাতে যাবার সাথে বিয়ের কি সম্পর্ক! ‘

-‘ তোরা কি একটু থামবি এবার। ‘

নাদিয়ার মা পরিস্হিতি সামলাতে এগিয়ে এলো।

-‘ স্যরি মা, এতদিন আমি সম্পর্কের মান রাখতে গিয়ে চুপ থেকেছি।আর পারবো না।ফুপু আমার বিয়ে হলে তো তোমারই ভাবনা দ্বিগুণ হবে, তখন বলবে কবে বাচ্চা নেব।তারপর আবার কি নিয়ে প্রশ্ন করবে, তৈরি থেকো কিন্ত।’

-‘দাদা আমি আসি।’

মতিন সাহেব নাদিয়ার মাথায় হাত রাখলেন।

-‘ মারে, মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গেল না ?! ‘

-‘কিসের? ‘

-‘ তোর রাগের, আর কি! এখন যা হাত মুখ ধুয়ে টেবিলে আয়, নাস্তা করবি।’

নাদিয়া নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়লো।যদিও মনটা ঠিক নেই এখন।তবে অনেকদিন পর রিক্সায় ঘুরতে ভাল লাগছিলো।দুপুরে একটা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চের পর বেরিয়ে, বাড়ি ফেবার কথা ভাবতে না ভাবতেই রাস্তার একটু সামনে নজর পড়লো তার।এগুতেই দেখে একজন লোক অচেতন ভাবে রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে।দেখে মনে হচ্ছে, কোন গাড়ি বা বাসের সাথে ধাক্কা খেয়ে এমনটা হয়েছে।নাদিয়ার মতো আশেপাশে আরও লোকজন আছে ফুটপাতে।কিন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, কেউ একটিবারের জন্যে এই লোকটির দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না! নাদিয়া ভাবলো, অযথা কোন নতুন ঝামেলায় জড়াবার প্রয়োজন নেই।তাই বাড়ি ফেরার জন্যে সে রিক্সা নিয়ে নিলো।কিছুদূর যেতে না যেতেই, সে রিক্সাওয়ালাকে আবার ফেরত যেতে বললো।কারণ, সে নিজেও জানে এভাবে লোকটাকে ফেলে গেলে রাতে তার একফোটাও ঘুম হবে না।নাদিয়া লোকটার ওয়ালেট বা সেলফোন কিছুই খুঁজে পেল না।লোকটাকে হাসপাতালে ভর্তি করে সে বাড়ি ফিরলো।ডাক্তার জানালেন, রোগীর তেমন কিছু হয়নি।কাল বা পরশু রোগী বাড়ি যেতে পারবেন।

পরদিন নাদিয়া আবার হাসপাতালে গেল।নাদিয়ার এই প্রথম লোকটির সাথে কথা হলো।

-‘এখন, কেমন আছেন আপনি? ‘

-‘এইতো, আগের চেয়ে ভালো। ‘

-‘আপনার বাড়ির কারো নাম্বার বলুন।আপনার সেলফোন খুঁজে পাই নি। তাই আমি কাউকে ইনফর্মও করতে পারি নি। ‘

নাভিদ নাদিয়া প্রশ্নের তেমন কোন উত্তর দিলো না।

-‘ সমস্যা নেই, আমি পারবো ম্যানেজ করতে।আপনার নাম্বারটা দিন, আমি বাসায় পৌঁছে আপনাকে হাসপাতালের বিলটা পাঠিয়ে দেব তাহলে। ‘

-‘ না তার দরকার নেই। আমি আসি, ভাল থাকবেন।’

নাভিদ আর কিছু বলার আগেই নাদিয়া চলে গেল।

নাদিয়া তার বাড়ির সামনে পৌছাতেই, নাভিদ পেছন থেকে ডাকলো,

-‘ এই যে ম্যাডাম, আমার রিক্সাটারও ভাড়া দিন।আমার ওয়ালেট তো ছিনতাইকারীর কাছে। ‘

-‘ কি ব্যাপার! আপনি আমাকে ফলো করছেন কেন? ‘

-‘আমি না, রিক্সাওয়ালা মূলত আপনাকে ফলো করছিলো। ‘

নাদিয়ার চোখ রাঙ্গানো দেখে নাভিদের হাসি পেল।যদিও সে নিজেকে কিছুটা সংযত করে নিলো,

-‘ আচ্ছা স্যরি,ক্ষুদা পেয়েছে কিছু খাওয়া হয় নি।আর,বাড়ি ফিরবার মতো টাকা আমার কাছে নেই।’

নাদিয়া কিছু টাকা দিলো নাভিদকে।

-‘ আমি বাইরের কোন খাবার খেতে পারি না। ‘

এবার রীতিমতো বিরক্ত লাগছে নাদিয়ার।ছেলেটা তার পিছু ছাড়ছেনা কিছুতেই!

উপায় না দেখে,নাভিদকে বসার ঘরে নিয়ে এলো নাদিয়া।এরপর মাকে ডাক দিয়ে বললো,

-‘ওনাকে কিছু খাইয়ে বিদায় করো মা, প্লিজ।আর পারছি না।’

নাভিদ নিজের পরিচয় দিতে গেল নাদিয়ার মাকে ; তবে নাদিয়া তাকে থামিয়ে দিলো,

-‘ আর বলতে হবে না।একটু চুপ থাকেন দয়া করে।আপনার কথা কাল রাতে আমি মাকে বলেছি। ‘

এরপর সে নিজের রুমে চলে গেল।

– ‘বাবা,কিছু মনে করো না।ওর কথার ধরন এমনই কিন্ত, মনটা খুব নরম।’

-‘ সেটা আমি অনেক আগেই বুঝে গিয়েছি।আমি আসলে কিছু কথা বলতে আপনার কাছে এসেছি।’

-‘ বলো, কি কথা? ‘

নাদিয়ার সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ব্যক্তিত্ব কি করে নাভিদের হৃদয়হরণ করেছে ; সেকথা সে নাদিয়া মাকে জানায় এবং সে সরাসরি নাদিয়ার মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব জানায়।আর,নিজের ব্যাপারে সব কিছুও তাকে জানায়।এরপর কথায় কথায় নাভিদ জানতে পারে, দু-বছর আগে নাদিয়ার অনেক ধুমধাম করে ইনগেজমেন্ট হয়েছিল।তবে, বরপক্ষের সাথে পরিবর্তীতে বোঝাপড়ায় মিল না হবার ফলে তা ভেঙ্গে যায়।এরপর থেকে নাদিয়া কেমন যেন নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছে।আর,এই ঘটনার পর নাদিয়াকে তারা বিয়ের ব্যাপারে আর কিছু বলেন নি।তাছাড়া নাদিয়া নিজেও এখন বিয়ে নিয়ে ভাবছে না।নাভিদ বুঝিয়ে বলে, সময়ের সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল সে নাদিয়াকে সব বোঝাবে এই আশ্বাস দিয়ে নাদিয়ার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেয় নাভিদ। এদিকে নাদিয়া নাভিদের প্রস্তাবে বেশ ক্ষেপে যায়।

-‘আপনি আমাকে একদিন দেখেই বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। আপনি কি পাগোল! কতটুকু জানেন আমার সম্পর্কে? আর, আমি তো আপনাকে ভাল করে চিনিও না। ‘

-‘ দেখুন নাদিয়া, আপনি একটু শান্ত হন।’

নাভিদ তারপর বুঝিয়ে বলে যে, সে এক্ষুনি বিয়ে করতে চাচ্ছে না।নাদিয়াকে আরো ভালো করে সে চিনতে চায়, বুঝতে চায়।এরপরে নাদিয়ার সম্মতি থাকলেই তারা বিয়ের দিকে এগোবে।সবকিছু শোনার পর নাদিয়া কিছুটা শান্ত হয়।তবে মনে মনে জেদ চেপে রইলো।তাছাড়া , সে বুঝে গেছে একদিনেই নাভিদের সাথে কোন জোর করা যাবে না।ধীরে ধীরে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

এরপর নাদিয়া আর নাভিদের প্রায়ই দেখা হতে লাগলো।নাভিদের সাথে নাদিয়াও একসাথে কাটানো সময়গুলো বেশ উপভোগ করছিলো।তবে নাভিদের জন্য তার মনের গহীনে কোন স্পন্দন সে খুঁজে পাচ্ছিলো না।কেবল অমিলগুলোই নজরে

পড়ছিলো।এদিকে নাভিদের ভাবনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।তার ভাষায়, দুজনের মাঝে একটু অমিলের ছোঁয়া না হলে জীবনের ছন্দটাই যেন হারিয়ে যায়।সত্যি কি তাই!

এরপর কোন এক বিকেলে নাদিয়া নাভিদের সাথে দেখা করতে চাইলো।

-‘ দেখো নাভিদ, এভাবে তো আর হয় না। ‘

-‘ না হলে তো আরো ভাল।চলো বিয়ে করে ফেলি। ‘

-‘ আমি কি ঠাট্টা করছি! তোমার সাথে আমার আর হচ্ছে না।আর জোর করে কিছু পাওয়া যায় না নাভিদ। ‘

-‘তোমার মনে হয়, যে আমি জোর করছি! বুঝলাম না,কিভাবে নাদিয়া! ঠিক আছে, তোমার সাথে সব যোগাযোগের পথ আমি নিজেই বন্ধ করবো আজ। আমার অনুভূতিগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে তোমার জন্য, তবে তুমি নিজেই আমাকে খুঁজে নেবে।’

নাভিদের এই ক্রুদ্ধ আচরণ নাদিয়ার মনে স্বস্তি জোগালো।কারণ সে নিশ্চিত যে,নাভিদ আর তাকে জ্বালাতন করবে না।

বেশ কিছুদিন পরের কথা।মতিন সাহেব নিজের কাজ থেকে অবসর নিয়ে, নাদিয়াকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন।অফিসের সমস্ত দায়ভার এখন নাদিয়ার।দু-বছর আগে মাকে হারাবার পর নাদিয়া ভীষণ একা হয়ে গিয়েছিলো।যদিও এখন নিজেকে বেশ ভালভাবেই সামলে নিয়েছে।তবে, সংসার জীবনের কথা ভাবতে সে আগ্রহী নয়।কেন সে উত্তর তার জানা নেই!

নাভিদের সাথে আর কখনো তার দেখা হয়নি।নাদিয়ার বান্ধবী রিনির বেশ ভাল লাগতো নাভিদকে।নাভিদ চলে যাবার পর রিনি নাদিয়াকে বহুবার বলেছে, তার সাথে যোগাযোগের কথা।তবে নাদিয়া এই ব্যাপারে আর এগোতে চাচ্ছিলো না।

এদিকে মতিন সাহেব মেয়েকে বিয়ের কথা বুঝিয়ে বলেন।এরপর মেয়ের সম্মতি থাকায় তিনি, সজীবের কথাটা নাদিয়াকে বলেন।সজীব মতিন সাহেবের বন্ধুর ছেলে, পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার।ঠিক হলো, কাল সজীব আর নাদিয়া একে অপরের সাথে দেখা করবে।পরদিন নাদিয়া সময়মতো সজীবের সাথে দেখা করার জন্যে বেরিয়ে পড়লো।কিন্ত সেখানে সজীবের পরিবর্তে নাভিদকে দেখে সে চমকে গেল।

-‘কি ব্যাপার, তুমি কেন! ‘

-‘জি, আমারই তো থাকবার কথা। ‘

-‘ নাভিদ, তুমি কি আমার পিছু ছাড়বে না! ‘

-‘ কি বলছেন, আমার নাম সজীব! ‘

নাদিয়া কিছু বুঝতে পারছে না।কি বলছে নাভিদ এইসব! আর সজীব কোথায় তাহলে? নাদিয়া সজীবকে নানা ধরনের প্রশ্ন করার পর অবশেষে বুঝতে পারলো,সে নাভিদ নয়।বাড়ি ফিরে প্রথমেই নাদিয়া তার বাবাকে জানালো যে,সজীব পুরোপুরি দেখতে নাভিদের মতন।মতিন সাহেব মেয়ের এমন উদ্ভট কথা শোনার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না।কারণ, তিনি জানেন সজীব দেখতে নাভিদের মতো নয়।

মতিন সাহেব মেয়েকে নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন।নাদিয়ার এই অদ্ভুত কান্ডের কথা শুনে রিনি আর চুপ থাকতে পারলো না,

-‘নাভিদের সাথে যোগাযোগ কর, নাদিয়া। এখনো কি বুঝতে পারছিস যে,তোর নাভিদকে ছাড়া চলবে না। গাধী কোথাকার!’

নাদিয়া বুঝতে পারলো – সে এতদিন মনের মাঝে শুধু নাভিদের সাথেই ছিল।নাভিদকে খুঁজতে নাদিয়ার সাথে রিনিও অনেক চেষ্টা করেছিলো।তবে, নাভিদকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না! এভাবেই কেটে গেল অনেকগুলো বছর।

অনেকদিন পর আলমারি থেকে একটা শাড়ি বের করেছে নাদিয়া।তার এক কলিগের মেয়ের বিয়ে আজ।যদিও প্রথমে যাবার ইচ্ছে ছিল না তার।কিন্ত পুনম আপা এতবার ফোন করেছে সকাল থেকে, তাই আজ না গেলেই নয়।

নাদিয়া ওখানে পৌঁছে পরিচিত তেমন কাউকে দেখতে পেল না।মনে হয় অন্যদের তুলনায় সে একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছে।তাই একাকী কিছুসময় বসে রইলো।মাঝে পুনম আপা কিছুক্ষণ তাকে সঙ্গ দিলো।হঠাৎ নাভিদ নাদিয়ার পাশে এসে বসলো।নাদিয়ার কলিগই হলো নাভিদের চাচাতো বোন।

-‘ আমাকে আর খুঁজলে না তুমি? ‘

নাদিয়া তার হৃদয়ের জমে থাকা মেঘগুলোকে আর সংবরণ করতে পারছিলো না।

-‘প্লিজ নাদিয়া কাঁদো না।আরে!! এই দেখো তোমার কাজল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! ‘

নাদিয়া একটু হাসলো এবার।

-‘দেখছো না, তোমাকে খুঁজতে খুঁজতেই আজ কালো চুলোগুলো সাদা হয়েছে। ‘

-‘এই দেখো না, আমারো একই অবস্থা। ‘

দুজনেই একসাথেই হেসে উঠলো।

-‘তোমাকে এবার আর কোথাও হারাতে দেব না আমি।’

নাদিয়া শক্ত করে নাভিদের হাতটা ধরলো।

হয়ত নাভিদ বা নাদিয়ার বয়সটা থেমে নেই সময়ের সাথে।তবু জীবনের এই শেষ বিকেলে আজও জমে আছে অনেক কথা।আর সেই জমে থাকা কিছু অক্ষেরর পূর্ণ মিলনের নাম হলো – ভালবাসা।

????????

বীণামিকা কে আমি ভুলতে পারব না ! জানি এটা কোন দিন সম্ভব নয় ! একটা অদ্ভুত অপরাধ বোধ আমাকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়ায় । কথা গুলো বলেই মাহাবুব চেয়ারটা সোজা করে সিটি হল থেকে সোজা পাহাড়ের দিকে তাকাল ।অদিতি প্রায়ই সাপ্পোরো সিটি হলে যায় ইতালিয়ান পেস্তা খেতে ।জাপানিজ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জাইকাতে চাকুরির কারনে অদিতি সাপ্পোরোতে আছে প্রায় দুই বছর হল । একা একা ঘুরে বেড়ানো আর নিজেকে কিছু সময় দেওয়ার মধ্যে একটা আলাদা সুখ আছে । এখানে কিছু ইন্ডিয়ান এবং নেপালি দেখা গেলে ও বাংলাদেশিদের খুব কম দেখা যায় ।

আর সেখানেই সে মাহাবুব কে দেখে । প্রথমে কয়দিন ভেবেছে হয়তো অন্য কোন দেশের হবে । তারপর পরিচয় । মাহাবুব কিউশু বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক ।এখানে এসেছে ছয় মাসের একটি প্রোজেক্ট এর কাজ নিয়ে।খুব অল্প পরিচয় । কিন্তু দুই সপ্তাহে বেশ আন্তরিক বোঝাপড়া হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে। ব্যক্তিগত বিষয় আর সম্পর্ক এর এক প্রশ্নেই সে নিজের গল্পটা শুরু করল ।তারপর সে আবার চেয়ারের সামনে এসে বসল । নিজ থেকেই বলা শুরু করল ।

বুঝতে পারিনা । সৃষ্টিকর্তার অদ্ভুত খেয়াল । সে ছিল একটা সঙ্গীতের মতো প্রানবন্ত আর উচ্ছল । একটা দুর্দান্ত সুরের মূর্ছনা হয়ে আমার ভিতরের কান্নার শব্দ গুলোকে নিরব করে রেখে ছিল । আমার স্বপ্নের আকাশে জমা মেঘ গুলোকে সরিয়ে দিয়ে জোস্না রাতের চাঁদ নামিয়ে এনে ছিল । আমার জীবনের থেমে থাকা দুঃসময় গুলোকে দুর্দান্ত সমুদ্রের মতো করে তুলেছিল । আমি যেন আবার নতুন জীবন নিয়ে পৃথিবী দেখা শুরু করলাম । আমি তখন মাত্র ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা শেষ করে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিচ্ছি । এর মধ্যেই বাবা আমার জন্য মেয়ে দেখা শুরু করেছে । ট্রেনিং শেষ করে প্রথম চাকুরি এএসপি হিসেবে গাজিপুর থানা । সেখানেই আমার বিয়ে হল অরু নামের একটি মেয়ের সাথে । মেয়েটি অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্রী । দেখতে ভাল । আমার মতো ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে আগ্রহ । মনে মনে ভাবলাম ভালই হবে । কবিতা আর সাহিত্য আলোচনা করে সংসারটা সুন্দর ভাবেই কেটে যাবে । কিন্তু বিয়ের দ্বিতীয় দিন অরু আমাকে জানিয়ে দিল সে আমাকে কোন দিন ভালবাসতে পারবে না । কারন স্কুল জীবন থেকে সে তার চাচাতো ভাইকে ভালবাসে । সে আমাকে ঠকাতে চায়না । তার মা তাকে জোর করে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছে ।

অদিতি খুব চুপচাপ তার কথা গুলো শুনছিল । তারপর বলল আপনি কি করলেন ?

জানিনা হঠাৎ শরীরের রক্ত প্রবাহ কোথায় যেন থেমে গেল । স্বপ্নের আকাশে উড়া বুনো পাখি গুলো পাখা ঝাপটে এক এক করে নিচে পড়ে যেতে লাগল । গভীর স্বপ্নে নদীতে পাল তোলা নৌকা নিয়ে হারিয়ে যাওয়ার পথ অন্য দিকে বাঁক নিল । এ কেমন নিয়তি ! নিজের স্বপ্নের জীবনটা বিষাদে ভরে উঠলো । আমি আর এই বিষাদের ভার বইতে পারছিলাম না । যাকে ভালবাসব বলে জীবনে জায়গা দিলাম সে আমাকে ভালবাসে না । যে ভালবাসে না কিংবা ভালবাসা চায়না তাকে নিয়ে ভাবা যে খুব কঠিন । বিবেক আমাকে থামিয়ে দিল । আমি একদিন অরুকে মুক্তি দিয়ে দিলাম । কিন্তু অরু খুশি হলেও অরুর মা কিছুতেই মানতে চাইল না । একটা ভাল পাত্র ,একটা চাকুরি একটা সামাজিক অবস্থান এই সব কিছুই হয়তো একটা সম্পর্ক তৈরি করেছিল । কিন্তু সেখানে মন নিয়ে ভাবনার কোন অবকাশ ছিল না তাই কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হলাম । অরু ফিরে গেল তার ভালবাসার মানুষের কাছে । আমি অনেক দিন অনেক বেশি কাজে মনোযোগী হয়ে গেলাম ।

অদিতি বলল ,কেন আপনি কাউকে খুঁজে নিতে পারতেন ।জীবন ছোট মনে হয় কিন্তু আসলে অনেক বড় । মাহাবুব মাথা ঝাঁকাল । কেউ একজন তো এসেছিল আমার জীবনে !

তারপর কোন একদিন । বীণামিকার গল্পটা শুরু হল ।সে ছিল ডাক্তার । মনের মতো পাত্র পাচ্ছিল না । ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে এক আসামী কে দেখতে গিয়ে পরিচয় । তারপর জানা শোনা । জীবনের অভিজ্ঞতা বিনিময় । তারপর সবটুকু দুঃখকে আপন করে নিয়ে বীণামিকা আমার জীবনে এল । তথাকথিত সমাজ এবং সামাজিক নিয়মের দৃষ্টি অনেকটা যেন বাঁকা চোখে

তাকাল । কারন টা হল বীণামিকার জীবনে পূর্বে স্বীকৃত কেউ ছিল না । ঠিক অরু যেমন ছিল আমার জীবনে । সে হয়তো ভালবাসত কাউকে তা কেবল মনে মনে । শিক্ষা এবং পেশাগত জীবনেই সে সময় উপভোগ করেছে । অনেক ব্যস্ততা কে সঙ্গী করে । দুঃখ কে অতীত করে আমরা একটি নতুন জীবন রচনা করলাম । ওই যে সমাজ বলে একটা শব্দ আছে আমাদের জীবনে । অনেক গুলো সামাজিক সম্পর্ক দিয়ে একটা সমাজ । আর ওই সম্পর্ক গুলোর মধ্যে কিছু মানুষ আমার আর বীণামিকার সম্পর্কটা কে বিষিয়ে তুলল । আমরা বড় হিংসাত্মক আর হীন মানসিকতায় ভরপুর পৃথিবীতে জন্মেছি । সেখানে বেঁচে থাকাটা সত্যি কষ্টের । যে দুর্ঘটনার গল্প আমরা নিজেরা ভুলে যাই । যে দুঃস্বপ্নের ছায়া আমরা নিজেরা স্বীকার করিনা । তখন কিছু কুৎসিত মনের মানুষ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মনে করিয়ে দিয়ে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পায় । আমার আর বীণামিকার সুন্দর নতুন জীবনটা অনেক হিংসুটে চোখ যেন সহ্য করতে পার ছিল না । কখনও এই জটিল সমাজ আমার গল্প টেনে এনে বীণামিকার মনটা ছোট করে দিতো । আবার কখন ও বীণামিকার সাহস আর উদারতা কে সন্দেহের জালে আঁটকে দিত । এই যেন হীন সমাজ ব্যবস্থার অদ্ভুত আর নিভৃত কুৎসিত আনন্দ । ধীরে ধীরে বীণামিকা মানুষ আর সমাজ এড়িয়ে থাকতে ভালবাসত । একা থাকাতেই শান্তি পেত । আমি আমার কাজ নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকাতে ঠিক যেন ওর স্পর্শ কাতর আর সংবেদশীল মন টা কে বুঝে উঠতে পারিনি । একদিন বুঝলাম বীণামিকা কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে । চোখের নিচে গভীর দুঃখের ছায়া । ওর আগের চেহারাখানি আর নেই । ও ভিতরে ভিতরে খুব কষ্ট পেত । নিয়তি আর জীবন ওর কাছে ভীষণ দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল । সেখানে মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা ,স্নেহ ,সহানুভূতি ছিল না । মানুষের মন আর জীবন হৃদয় দিয়ে বুঝবার মানুষ নাই পৃথিবীতে । এই সব শূন্যতা ওকে অসহায় করে তুলে ছিল । ওর গভীর দুঃখবোধ অচেনা এক কঠিন রোগ ডেকে নিয়ে এল । আমি হারালাম আমার বেঁচে থাকা । আমার জীবন । আমি পুলিশের চাকুরিটা ছেড়ে দিয়ে উচ্চ শিক্ষা নিতে জাপান চলে এলাম । আর ফিরে যাওয়া হয়নি । অনেকদিন পর কোন বাংলাদেশির সাথে কথা বলছি ।খুব ভাল লাগছে । অদিতি একদম স্তব্ধ হয়ে গেল । সেদিনের পেস্তাটা আর খাওয়া হল না । কিছু গল্প যেন কোথাও কারও না কারও কাছে প্রকাশ করতে হয় । আবার কিছু গল্প থাকে কখনও প্রকাশ করা হয় না । ঠিক প্রকাশ করা যায়না । অদিতির একান্ত গল্পটা হয়তো সেই রকম কিছু । তাই আর সেদিন সে কোন কিছু ভেবে পাচ্ছিলনা । মাহাবুব এর দুঃখে পোড়া চেহারার দিকে আর তাকাতে ইচ্ছে করল না । কিছু বলতে ও ইচ্ছে করল না । শুধু জিজ্ঞেস করল ,কবে সাপ্পোরো ছেড়ে যাচ্ছেন ?

মাহাবুব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দিয়ে বলল ,সামনের সপ্তাহে । আপনি ?

অদিতি উত্তর দিল , সামনের বছর । কথাটা বলেই সে একটু আগে আগে বের হয়ে গেল । আর পিছনে তাকাল না । কারন দুঃখ হয়তো মায়া বাড়াতে পারে । মায়া মমতা খুব বেশি কঠিন আর ব্যাখ্যাতিত ।

??????? ????????

এক কালে ছিল এক রাজপুত্র যার এক রাজকন্যাকে বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল। তাকেই সে বিয়ে করবে যে একজন প্রকৃত রাজকন্যা। সেই রাজকন্যাকে খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে সে পৃথিবীর সবত্র ভ্রমণ করলো। কিন্তু সব জায়গাতেই বিভ্রান্তি দেখা দিল। অসংখ্য রাজকন্যা ছিল, কিন্তু তারা প্রকৃত রাজকন্যা কি না তা সে কিভাবে জানবে? তা ছাড়া তাদের সবার মধ্যেই কিছু না কিছু খঁুত ছিল। অনেক খঁোজাখুজির পর বিষণ্ন হয়ে সে বাড়ি ফিরল। যে উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হয়েছিল তার সন্ধান মিলেনি।

এক সন্ধ্যায় প্রচন্ড ঝড় হল।বজ্রপাত সহ বৃষ্টি হচ্ছিল।পরিস্তিতি সত্যিকার অর্থ এ খুব ভয়াবহ ছিল।এর ই মধ্যে প্রবেশের দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল।বৃদ্ধ রাজা দরজা খুলতে এগিয়ে গেল।

দরজা খোলা মাত্র দেখা গেল এক রাজকন্যা সেখানে দঁাড়িয়ে। ঝড় বৃষ্টিতে তার যে কি অবস্থা। চুল থেকে শুরু করে জামা, জুতা সব পানিতে ভেজা। রাজার কাছে দাবী করলো যে সে প্রকৃত রাজকন্যা এবং রাজপুত্রের রাজকন্যা অনুসন্ধান করার খবর পেয়ে এ মহলে এসেছে। ‘তুমি প্রকৃত রাজকন্যা কি না তা আমরা শীঘ্র ই আবিস্কার করবো’ বৃদ্ধ্য রাজা ম নে ম নে ভাব ল। এ বিষয়ে একটু ও কথা না বলে শোবার ঘরে গেল। বিছনার চাঁদ র সরিয়ে সেখানে একটি মটর শুটি রাখল। তারপর বিশটি তোশক সেই মটর শুটির উপর রাখল।এরপর বিশটি আরামদায়ক পালকের বিছানা সেই তোশকগুলির উপর রাখল।ঠিক করলো রাজকুমারীকে এর মধ্যে রাত্রি যাপন করতে দেয়া হবে।

সকাল হবার পর বৃদ্ধ্য রাজা রাণী সেই রাজকন্যা কে জিজ্ঞাসা করলো, ‘তুমি কি ঠিকমত ঘুমাতে পেরেছিলে?’

‘ওহ!’ রাজকুমারী বলল, ‘ না, আমি শান্তিমত ঘুমোতে পারিনি। সেই বিছানায় শোবার পর আমি খুব ই শক্ত কিছু অনুভব করছিলাম যার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছিল। সেটা খুব ই যন্ত্রণাদায়ক ছিল।

তারা বুঝতে পারল যে, মেয়েটি সত্যিকারের রাজকন্যা এবং তাতে কোন সন্দেহ নেই।বিশটি তোশক ও বিশটি পালকের বিছানার ওপর দিয়ে একটি মটর শুটি অনুভব করা কেবল মাত্র একজন রাজকুমারীর পক্ষেই সম্ভব। এছাড়া আর কেউ এরকম স্পশ কাতর হতে পারে না।রাজকুমার তৎক্ষণাৎ তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিল। সে বুঝতে পারল যে সে প্রকৃত রাজকন্যাকে খঁুজে পেয়েছে।

যে মটরশুটির কারণে এ ঘটনা ঘটলো, সেটা তারা জাদুঘরে রেখে দিল।সেখানে তা এখনো দেখা যাবে যদি কেউ না সরিয়ে থাকে।

-বিদেশী গল্প অবলম্বনে লেখা

?????????? ????????

তিনি আমার আমার প্রাক্তন সহকর্মী । বাংলাদেশের অন্যসব ব্যস্ত কর্মজীবীদের মতোই খুব ব্যস্ততা নিয়ে অফিসে আসে । তাঁর ক্লান্তি মাখা ঘুম ঘুম চোখ দিয়ে যেন অনেকটা সময় অফিস ব্যস্ততার সরষে ফুল দেখে ।

আমার অনেকটা সময় এমন করেই কাটে । তারপর মধ্যাহ্নের কিছু আগে তার নরম কণ্ঠ শোনা যায় । কারন টা হল তিনি মধ্যাহ্ন ভোজের এবং প্রার্থনার বিরতিতে যাবেন ।
আমি স্বাস্থ্য এবং রূপ সচেতন নাগরিক ।কাজের ফাঁকে এক কাপ চা আর সামান্য সালাদেই আমার ক্ষুধা মিটে যায়।তাই আমার মধ্যাহ্ন ভোজ নেই ।আর ব্যস্ত সময়ে কাজে ফাঁকি দিয়ে বেশি সময় প্রার্থনায় মগ্ন হতেও সবাই পারে না । কিছু মানুষ প্রার্থনার উছিলায় অতিরিক্ত সময়টুকু নিজেকেই দেয়।
তাই সে সময়টা তাঁর কাজ গুলো আমাকেই দেখতে হয় । সে সুবাদে আমি যে তাঁর কাছে মন গলে যাওয়ার মতো কিছু পাই তা কিন্তু নয় ।তবে একটা ভ্রম বা আকর্ষণ তো আছে । কিংবা ওই যে মানুষের প্রতি মানুষের মায়া । হতে পারে তার প্রতিদিনের সকাল সন্ধ্যা বুক ফাটা আর্তনাদ ।
যা পাশে বসে কাজ করতে করতে শোনায় । আমি বিস্মিত হয়ে তাঁর আর্তনাদ গুলো একটু একটু করে কুড়িয়ে নেই । তারপর গভীর মায়া নিয়ে তাঁর দিকে তাকাই । দেখি তার উজ্জ্বল শ্যামলা চেহারায় অপরিপক্ক হাতের মেকাপের ছাপ । ভীষণ বেমানান কম দামী ফাউন্ডেশণটা কেমন ভেসে উঠেছে । ঠোঁটের লিপস্টিকটা কোনা বেয়ে গড়িয়ে পড়তে চাইছে । এক চোখে কাজল গভীর করে আঁকা ।তো আরেক চোখে যেন হাল্কা হাতের ছোঁয়া লেগেছে । আমি তার পুরো অবয়বে মনে মনে হেসে উঠি । তবে কিছু বলিনা । যদি ভুল বুঝে মিছে কষ্ট পায় । তবে পুরো চেহায় নকশি কাঁথার মায়া বুনা আছে । সংসারের হাজারও ক্লান্তিকর গল্পের ভিড়ে জানা যায় তিনি দুই সন্তানের জননী । কোন একসময়ে পিতা বিয়োগে ভাইদের সংসারে ভীষণ অসহায় হয়ে পড়েন ।

ভাইরা খরচ বাঁচাতে হাতের কাছে থাকা এক ব্যবসায়ীর হাতে বোনকে তুলে দেন । যাও কন্যা নিজের সংসার দেখো । দুই মাসের মাথায় বুঝলেন পাত্রের আগে একজন ভালবাসার মানুষ ছিল । সেই মেয়েটি প্রবাসে স্বামীর সাথে । দ্বিতীয় বাচ্চা কন্যা সন্তান জন্মের পর আরও স্পষ্ট হল তার স্বামী ফেলে আসা প্রেমে নতুন করে হাবু ডুবু খাচ্ছে । বাবা মা হীন অসহায় এই নারী কোথায় যাবে ।তার উপর অবুঝ দুই ছেলে মেয়ে ।

প্রতি দিন রাত এটা সেটা নিয়ে যুদ্ধ হয় । অনেক তাবিজ কবজ হয় । স্বামীর পুরনো প্রেম কিছুতেই যায় না । মনের দিক দিয়ে যে নারী অসহায় একটা কর্পোরেট চাকরি কি তাকে সব টুকু নিরাপত্তা দিতে পারে । তাই মনে আর শরীরে সব সয়ে যেতে হয় ।
মানুষ মাঝে মাঝে ভীষণ ক্লান্ত হয় তার জীবন এবং জগত নিয়ে ।আমি তাকে দেখে অনুভব করি । মানুষ শুধু ক্লান্ত নয় কেমন দিগভ্রম ও হয় । আমাকে তার কাজ গুলো করে দেওয়ার নিয়মিত অন্যায় আবদারে পরিনত হল। কিছুই বলতে পারি না । একটা অদম্য বিরক্তি আমাকে ও অসহ্য করে তুলে । কিন্তু একটা ভদ্রতা আমাকে থামিয়ে দেয় । আমি বাধ্য হয়ে তার প্রতিদিনের

বঞ্চনার গল্প শুনি ।

তার জীবনে প্রথম পুরুষ তাঁর স্বামী ।আর তার স্বামীর জীবনে সে দ্বিতীয় নারী । বিয়েই সব নয় ।সামাজিক রীতি সমাজ চালায় ।আর মনের স্বীকৃতি জীবন চালায় ।অমন অগোছালো নারীর মুখে এমন উচ্চমার্গের কথা আমাকে হতবাক করে ।এমন অগোছালো জীবনে কেমন গোছালো দুঃখের পসরা সাজানো । তার শিল্পিত আর স্বেচ্ছাচারী স্বামীর একটা কাল্পনিক অবয়ব আমার মনের গল্প শুনতে শুনতে অঙ্কিত হয় ।

আমি মনে মনে ভাবি হয়তো কোন রূপবান এবং সুপুরুষ । যে কিনা এই বিধ্বস্ত মায়াবী নারীকে অযোগ্য মনে করে ।
এমন করে প্রায় ছয় মাস আমরা পাশাপাশি কাজ করি। সে ব্রাঞ্চ ট্রান্সফার হয়ে যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে । কোন একটা প্রয়োজনে এক ভদ্রলোক অফিসে ঢুঁকে কাউকে খুঁজতে থাকে । তখন আমার সহকর্মী মাগরিব নামাযের প্রার্থনায় । ছোট খাটো রোগাটে ভদ্রলোকের সামান্য ঘাড় বাঁকা । কম দূরত্বে মুখোমুখি থাকায় অনিচ্ছা স্বত্বেও তার দিকে আমার চোখ গেল । আমার সামনের পিয়ন কে বললাম চেয়ার টেনে দিতে তাকে বসার জন্য।
কিছুক্ষন পর তিনি নামাজ থেকে ফিরে এলেন । সুপ্রিয় স্বামীকে দেখে আবেগে আপ্লুত হলেন । তাদের দুজনের হঠাৎ প্রেম দেখে আমি বোকা হয়ে গেলাম । আর বুঝলাম পরক্রিয়ায় আসক্ত হতে রূপ , অর্থ কিংবা ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয়না । আমরা জন্মগত কিংবা স্বভাবগত ভাবেই দ্বিচারিণী । একটা দ্বিমুখী মন আমাদের সবার ভিতরেই লতার মতো প্যাচিয়ে থাকে । যা খুব গোপনে সুযোগ পেলেই নিজের মতো আচরন করে ।

??? ???????

ছোট বেলা থেকেই আমি একা থাকতে ভালবাসি।হৈ – হুল্লোড় চেঁচামেচি এসব একদম ভালো লাগে না।আর হোস্টেলে বড় হবার কারণে, নিজের কাজগুলো গুছিয়ে করার অভ্যেসটাও আছে।অদ্ভুত ব্যাপার হলো, আমার যে দুজন ঘনিষ্ট বন্ধু – ইমন এবং জন ; ওরা ছিল আমার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের।তবে, বাহ্যিক আচরণগত দিক থেকে যতই অমিল থাকুক না কেন আমাদের মনের মিল ছিল অনেক বেশি।ইমন একদিন ঠাট্টার ছলে আমায় বলেছিলো,

– শৌমিক, আমার কেন জানি মনে হয় আমাদের মতোই এমন কোন হুল্লোড়বাজ…. ইয়ে মানে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই ধরনের শব্দ চয়ন একটু দৃষ্টিকটু দেখায়।হুম, চঞ্চলমনা বললে ঠিক হবে।এমন চঞ্চলমনা কেউই হবে তোর জীবনসঙ্গী।ভাবছিস, কেন বলছি এ কথা ? জানিস তো, ইলেকট্রন প্রোটনকে আর্কষণ করে।

ওর কথা শুনে আমি নিঃশব্দে হেসেছিলাম শুধু।একবারের জন্যেও মনে হয়নি, কথাগুলো পুরোপুরি বাস্তবে রূপ নেবে।এমনকি, যেদিন তোমার সাথে প্রথমবার দেখা হয়েছিলো সেদিনও না।

কি ভাবছো, ভুলে গিয়েছি ! আমাদের সেই প্রথম দিনের স্মৃতি !

ভুলে যেও না, তোমার চেয়ে আমার স্মৃতিশক্তি বরাবরই একটু বেশি রকমের ভাল ছিল।তুমি হয়ত পরখ করার জন্য প্রশ্ন করতে পারো – সেদিন তোমার পরনে কোন জামাটা ছিল, কিংবা চুলে তোমার প্রিয় নীল রঙা ক্লিপটা ছিল কিনা। সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি হয়ত অপারগ।অথচ, মজার ব্যাপার কি জানো ! তোমার মাথায় যে প্রশ্নটি একটিবারের জন্যেও আসবে না ; আমি কিন্ত ঠিকঠাক সে উত্তরটা দিতে পারবো।সেদিন তোমার শিশির ভেজা ঠোঁটে ছিল গোলাপী আভা।তাতে হয়ত আমার হৃদয়ের শত বছরের বদ্ধ কপাট উন্মুক্ত হয়েছিলো।যদি প্রশ্ন করো – প্রেমে পড়েছিলাম কিনা, তবে উত্তরটা হবে না।' প্রেম ' শব্দটার আক্ষরিক কিংবা অনুভবের দিক অর্থ্যাৎ, যেদিক থেকেই বলো না কেন ; তার স্হায়িত্বতা ভালবাসার চাইতে কম।তাই বলবো, সেদিন না হলেও এরপরে তোমায় ভালবেসে ছিলাম।বলতে পারো, একটু বেশিই ভালবেসে ছিলাম।আবারো ভুল করে ফেললাম, ছিলাম হবে না আজও তোমাকে অনেক বেশি ভালবাসি মধুরিমা।

তোমার উদ্ভট কান্ড দেখে প্রথমদিন খুব অবাক হয়েছিলাম ! একটা মোটামুটি বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ফুড কর্ণারে তুমি- আমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ট্রলিতে কিছু টুকিটাকি নিচ্ছিলাম।অথচ,একটিবারও আমাদের চোখাচোখি হলো না।আবারো দুজন ক্যাশ কাউন্টারের দিকে এগিয়ে এলাম।তুমি ছিলে আমার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে।কিছু না ভেবেই আমার সফট ড্রিংকসের মিনি কনটেইনারটা নিয়ে বললে,

– এটা তো আমি নিয়েছিলাম।আপনি ভুল করেছেন হয়তো।

তোমার অদ্ভুত আচরণ আমাকে পেছনে ফিরতে বাধ্য করলো।আর ভাবখানা দেখে মনে হয়েছিলো, ড্রিংকস কেবল একটি মাত্র অবশিষ্ট ছিলো।তবে কি জানো.....ওই যে তোমার হাসিটা ! তা দেখে আর কোন কটু কথা জবাবে বলা হলো না।

তারপর তুমি আর দেরী না করে, তৃষ্ণা নিবারণে ব্যস্ত হয়ে গেলে।তৃপ্তির স্বরে বললে,

– যা গরম পড়েছে। যাক একটু স্বস্তি পেলাম।

ডিসেম্বর মাসে, তারওপর সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই জায়গায় কি করে তোমার গরম অনুভূত হচ্ছিলো ; তা ভেবে আমি নিঃশব্দে হাসলাম।যে কারণে আমায় উদ্দেশ্য করে এমনটা বলেছিলে, তার ফলাফল কিন্ত ছিলো শূণ্য।অতঃপর.... আর কি, যা ঘটার তাই ঘটলো।ট্রলিতে তোমার নিজের রাখা ড্রিংকসের কনটেইনার দেখে স্বাভাবিকভাবেই তুমি আঁতকে উঠলে ! ততক্ষণে আমি বোধহয় ওখান থেকে বেরিয়ে পড়েছি।তাই বলে, তুমি পিছু ছাড়লে না।হুট করে আমার সামনে এসে, ড্রিংকসটা আমার হাতে কোনমতে ধরিয়ে দৌড়ে সেখান থেকে পালালে।আমি কি হাসবো নাকি, অবাক হবো ভেবে পাচ্ছিলাম না !

যদিও সেদিন জানতাম না আমরা একই এলাকায় থাকি অর্থ্যাৎ, প্রতিবেশী।সে বিষয়টা অবহিত হলেও তেমন কিছু হতো না।কারণ, তথাকথিত প্রেমিকদের মতো তোমার বাড়ির সামনে গিয়ে আমি সকাল-সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে থাকতাম না।তিন – চার দিন না যেতেই আমাদের দ্বিতীয়বারের মতো দেখা হলো।আমি যে রিক্সার ভাড়া ঠিক করছিলাম, তুমি এক লাফে ওটাতেই উঠে বললে,

– ভাই চলেন, বামদিকের দুনম্বর গলিতে।

এরপর আমার দিকে চোখ পড়তেই ভ্রু নাচিয়ে বললে,

– আরে আপনি ! কি খবর কেমন আছেন ?

আমি ভদ্রতা দেখাতে সামান্য হাসলাম।

– ও আচ্ছা, আপনি।

– কোথায় যাবেন ?

– বাসস্ট্যান্ডের দিকে।

– তাহলে উঠে পড়ুন।আমাকে ওই গলিতে নামিয়ে, একটু সামনেই তো বাসস্ট্যান্ড।

– কিন্ত !?

আমার কণ্ঠে দ্বিধার আভাস পেয়ে তুমি বলেছিলে,

– কোন ব্যাপার না, উঠে পড়ুন।

আমার জানা মতে, কোন মেয়ের অপরিচিত কাউকে এভাবে পাশে বসতে দেবার কথা নয় ! তুমি কেন দিয়েছিলে ? এই প্রশ্নটা কি আমার করা উচিত ছিল সেদিন ?

সেদিনের পর আমাদের যোগাযোগের গতি কিন্ত থেমে থাকে নি।পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় একে হয়ত বলা যেতে পারে, সুষম দ্রুতিতে সরল পথে চলতে থাকলো।ধীরে ধীরে আমার তোমাকে ভাল লাগতে শুরু করলো।তবে ভাললাগাটা যে কবে ভালবাসাতে পরিবর্তত হয়েছিলো, তা ঠিক জানি না।

কোন রকম বিশেষ আয়োজন ছাড়াই যেদিন তোমায় বলেছিলাম,

– একটা ছোট বাসা দেখি আমাদের জন্য ? দুটো বেড, একটা ড্রয়িং আর ডাইনিং।সারাদিন একা থাকতে পারবে তো ?

সেদিন তোমার অশ্রুসিক্ত নয়ন জোড়ায়, আমাদের সুখের আলয়ের প্রতিচ্ছবিটা দেখেছিলাম।

দুঃখজনক হলেও, আমাদের যে মিল ছিল তা হলো- আমরা দুজনেই বাবা-মাকে হারিয়েছি।

তুমি বড় হয়েছো ভাইয়া- ভাবীর সংসারে।যদিও, তোমার ভাবী মায়ের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।আর আমি, বাবা- মা মারা যাবার পর জামালপুর ছেড়ে চাকরির সুবাদে এখানেই আছি।বিয়ে নিয়ে এগোবার ক্ষেত্রেও আমাদের খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি।তোমার ভাইয়া খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের সম্পর্কটা মেনে নিলেন।বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিলো দিনগুলো।কিন্ত… সেই সুখ কি বেশিদিন আমাদের সঙ্গী হলো !!

অফিস থেকে ফেরার পর প্রায়ই দেখতাম, তুমি মনমরা হয়ে পড়ে থাকতে।কি হয়েছে জানতে চাইলে বলতে, সামান্য মাথাব্যথা আর কিছু না।যদিও, তোমার এই মাথাব্যথার বিষয়টা আমি তখন ঠিক গুরুত্ব দেই নি।সেটা নিঃসন্দেহে আমার একটা বড় ভুল

ছিল।তুমি প্রতিদিন খুব ভোরে উঠতে।যাতে আমাকে দুপুরে বাইরে খেতে না হয় তাই, নিজ দায়িত্বে খাবার তৈরি করে যাবার সময় আমার হাতে দিয়ে দিতে।সম্ভবত ফযরের নামাজের পর আর ঘুমোতে না।কিছুদিন পর লক্ষ্য করলাম, প্রতিদিনই তুমি রান্নায় কোন না কোন গোলমাল বাঁধাতে।কোনদিন লবণ দিতে ভুলে যেতে।কোনদিন ঝালের তীব্রতায় খাবার মুখে দেয়া যেত না।আবার কোনদিন অতি মাত্রায় হলুদের প্রয়োগে, সেটা কি ছিল হয়ত তা-ই সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা যেত না।

অথচ তোমার রান্নার হাত ছিল, আমার মায়ের মতন।বিয়ের আগে তা পরখ করার সুযোগ হয়েছিলো আমার।ভাবলাম, কিছুদিন ভাইয়া- ভাবীর কাছে থেকে ঘুরে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।ছোটবেলা থেকে ওনাদের কাছে ছিলে।হয়ত এখানে মন বসছে না।তাছাড়া, পুরোটা দিন বাড়িতে একা পড়ে থাকো।কিন্ত আমার কথায় তুমি তো কিছুতেই রাজী হলেই না, সেই সাথে ঢাকার বাইরে কোথাও ঘুরে আসার যে প্ল্যানটা করলাম ; সেটাও অসুস্থতার কথা বলে এড়িয়ে গেলে।তোমার যে লাবণ্যময়ী হাসি আমাকে মুগ্ধ করেছিলো, ধীর গতিতে তা আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছিলো।দিন দিন তোমার ভুলে যাওয়া অর্থ্যাৎ, স্মরণশক্তি হ্রাসের মাত্রা বাড়তে থাকে।সত্যি বলতে, সেটাও আমার তেমন ভাবে নজরে পড়েনি।মাথাব্যথার সাথে একটু- আধটু জ্বর থাকতো তোমার মাঝেমধ্যে।একদিন দেখলাম, আমার শার্ট অর্ধেক প্রেস করা ফেলে পাশের ঘরে কি যেন করছো।একটু পর আর কি ! যা ঘটার ছিলো তা-ই হলো।শার্টের কাঁধের কাছে অনেকটা জায়গা পুড়ে গেল।তোমার কান্না থামাতে বললাম,

– একটা শার্ট-ই তো, মধুরিমা।এমন কিছু হয়নি।

ওটা ছিল আমায় দেয়া তোমার প্রথম উপহার।তাই খুব কষ্ট পেয়েছিলে তুমি।

যেদিন তোমার অসুস্থতা অবশেষে আমার নজরে পড়লো, সেদিন বোধোদয় হলো – আসলেই একটু বেশি দেরী করে ফেলেছি।সেদিন সকালে তোমার শরীর ভাল না দেখে ঠিক করেছিলাম, লাঞ্চের পর ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবো।বাড়ি ফিরে, তোমায় না পেয়ে অজানা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেলাম।ভাইয়া – ভাবী, পরিচিত আত্মীয়স্বজন কোথাও ফোন করে কিছু জানতে পারলাম না।কিছু না ভেবেই বেরিয়ে পড়লাম।কোন দিকে যাচ্ছি, কি করা উচিত, কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না ! কিছুদূর এগোতেই দেখলাম, তুমি একজন ভদ্রলোকের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছো।লোকটিকে দূর থেকে হলেও, চেনা লাগছিলো।আরো একটু এগোবার পর দেখলাম, সে ছিলো হিল্লোল।ভাবীর ফুপাতো ভাই হিল্লোল, যার সাথে তোমার একসময়ে পারিবারিক ভাবে বিয়ে ঠিক হয়েছিল।কিন্ত হিল্লোলের সুমনা নামের কারো সাথে সম্পর্ক থাকায়, এ বিয়েতে রাজী ছিল না।

আমি দৌড়ে তোমার কাছে ছুটে গেলাম।কিন্ত, তোমার এ ধরনের কথা শোনার জন্য আমি মানুসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলাম না।

– আরে, কি করছেন আপনি ! আমার হাত ধরছেন কেন ? এখন আমার হবু বর হিল্লোল যদি মাইন্ড করে ? কেন এমন করছেন, আহ্ ছাড়ুন তো।

হিল্লোলের সাথে আমার দু-একবার দেখা হলেও, তেমন কোন কথা হয়নি কখনো।তোমার এরূপ আচরণের কি কারণ, তা সে আমার কাছে জানতে চাইলো।আমি ওকে কোন উত্তর দিয়ে, তোমাকে কিছুটা জোর করেই নিয়ে এলাম।হিল্লোল পেছন থেকে ডেকে ছিল কয়েকবার।তবে, আমি সাড়া দেইনি।বাড়ি ফিরে তোমায় নিজ হাতে খাইয়ে ঘুমোতে বললাম।পরদিন সকালে তোমাকে নিয়ে গেলাম ডাক্তারের কাছে।যদিও, তখন দেখলাম আমাকে তুমি ঠিকঠাক চিনতে পারছো।

সব জানার পর ডাক্তার যা বললেন তা ছিল কিছুটা এরকম-

ধীর গতিতে হলেও তুমি মনে রাখার ক্ষমতা বা স্মরণশক্তি যা-ই বলো না কেন, তা হারিয়ে ফেলছো।সেই সাথে অতীতের কোন সময়কে বর্তমান ভেবে, তাতেই বসবাস করছো।একে বলা হয় – পাস্ট ভার্সেস প্রেসেন্ট বর্ডারলাইন পারসোনালিটি ডিসওর্ডার (

Past Vs Present Borderline Personality Disorder) সেদিনের ঘটনানুযায়ী এর স্থায়িত্ব ক্ষণিকের জন্য হলেও, তা দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।তবে, উপযুক্ত চিকিৎসা তা হ্রাসও পেতে পারে।

সবকিছু শোনার পর মারুফ ভাই, সেই সাথে ভাই তোমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য অস্থির হয়ে গেলেন।আমি সারাদিন অফিসে থাকি।একা বাড়িতে তোমার সাথে কত দুর্ঘটনা-ই তো ঘটতে পারে – এসব বলে তিনি আমাকে বোঝালেন।কিন্ত আমি কিছুতেই রাজি হলাম না।অফিস থেকে এক মাসের ছুটি নিলাম।দিন দিন তোমার অবস্থা যাচ্ছিলো খারাপের দিকে।আমার সাথেও তেমন একটা কথা বলতে না।মাঝে মাঝে কি যেন দেখে ভয় পেতে ! পরে ইন্টারনেট থেকে জানলাম- এসব ক্ষেত্রে কোন কোন ওষুধের সাইড এফেক্টের কারণে হ্যালুসিনেশন হতে পারে।তবে তুমি এভাবে সব ভুলে যাবে, এতটা ভাবিনি ! পুরো বাড়িতে ছোট ছোট চিরকুট লিখে দিলাম সব প্রয়োজনীয় জিনিসের সামনে।

যেমন, ঘড়ি – সময় দেখার জন্যে।

রেফ্রিজারেটর – খাওয়া শেষ করে বাড়তি খাবারগুলো এখানে রেখে দিলে, তা ভাল থাকবে।

মারুফ ভাই তোমাকে মানুসিক হাসপাতালে ভর্তি করতে বললেন।ওনার কথায় আমি কিভাবে যেন ক্রোধে চিরবিরিয়ে উঠলাম।আর বললাম,

– খবরদার ভাই ! আপনি আমার মধুরিমাকে পাগোল বলবেন না।

একসময় চাকরিটাও ছেড়ে দিলাম। ভাবলাম সারাদিন তোমার কাছাকাছি থাকবো।আর্থিকভাবে স্বচ্ছল না হওয়ায়, আমাদের দিনগুলো খুব একটা ভাল কাটছিলো না।একদিন বাজার থেকে ফিরে তোমায় না পেয়ে, প্রায় উন্মাদ হয়ে গেলাম।ছুটে গেলাম মারুফ ভাইয়ের কাছে।ক্ষিপ্ত স্বরে বললাম,

– আপনি এমন করছেন কেন, আমার সাথে ? মধুরিমা কোথায় ?

ভাইয়া জানালেন,তুমি স্বইচ্ছায় ওনার সাথে এসেছো।কারণ, তুমি আমার সাথে কোন দিক থেকেই সুখে নেই।তোমার সাথে একবার দেখাও করতে দিলেন না।পুরো দুটা মাস এভাবে কেটে গেল।ফোনেও তোমায় পাওয়া গেল না।কোন আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধেও, ভাইয়া তোমার সাথে আমাকে দেখা করতে দিলেন না।উল্টো বললেন, তুমি যেখানে আছো ভালই আছো।আগামী মাসে আমাকে ডিভোর্স লেটার পাঠানো হবে।আর, তোমার অন্য জায়গায় বিয়েও ঠিক করেছেন তিনি।উনার প্রতি আমার মনে তীব্র ঘৃণা জন্ম নিলো।একদিন মারুফ ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে হুট করে তোমাদের বাড়িতে গেলাম।তোমাকে প্রতিটা ঘরে খুঁজলাম।ভাবীও বাঁধা দিলেন না।কিন্ত কোথাও তোমায় পেলাম না।ভাবীর হাতটা ধরে বললাম,

– প্লিজ ভাবী, ওকে কোথায় রেখেছেন আপনারা ? এ অবস্থায় ওর বিয়ের কথাই বা কি করে ভাবছেন ?! আমাকে শুধু একবার ওর সাথে দেখা করার সুযোগ দিন।

– শৌমিক, তোমাকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য মারুফ ওসব বলেছে।যাতে তুমি নিজের জীবন নিয়ে ভাবতে শুরু করো।আবারো নতুন করে সংসার করার কথা ভাবো।মধুরিমার বতর্মান অবস্থা আগের চাইতেও খারাপের দিকে।এখন হাসপাতালে আছে।

ভাবীর কাছে থেকে তোমার ঠিকানা পেলাম।এরপর….. শেষবারের মতো যেদিন তোমায় দেখেছিলাম, তুমি ছিলে হাসপাতালের বাগানে একটা বেঞ্চে বসা।

আর, পাশে একজন নার্স দাঁড়িয়েছিল।তোমার ঠিক পায়ের কাছে দুটো খরগোশের ছানা খেলা করছিলো।তোমার ঠোঁটে মায়াবী হাসির পরিবর্তে, সেদিন ছিল বিষনণ্নতার ছায়া।তাই নার্সকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে তোমার।উনি বললেন, তুমি যে তিনটি খরগোশ ছানার সাথে প্রতিদিন বিকেলে খেলা করতে ওদের একটি আজ সকালে মারা গেছে।সেজন্যে তোমার মন খারাপ।

আমি তোমার একটু কাছে গিয়ে বললাম,

– কেমন আছো মধুরিমা ?

তুমি চিৎকার করে একটা গাছের পেছনে গিয়ে লুকালে।নার্স তোমার দিকে এগিয়ে গেল।আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে তোমায় মনভরে কিছুক্ষণ দেখলাম।

কলমটা রেখে শৌমিক এবার কফিতে চুমুক দিলো।এখন তার অবসরের সঙ্গী হলো এই ডায়েরি।অফিস থেকে ফিরে, প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু সে লিখে এ ডায়রিতে।আর, ঘুমোবার সময় সেটা বালিশের পাশে রাখে।কে বলে মধুরিমা নেই তার পাশে ! ওর হাসিটা আবছা হলেও, আজও তার চোখেতে ভাসে।

..... সমাপ্ত.....

?????? ????? ???

তবে আজ মনে হয় নিজেকে বোঝাতে একটু বেশী সময় নিয়ে নিয়েছে সে।তাই ডাইনিং টেবিলে বসে ঘড়ি দেখে খানিকটা চিন্তায় পড়ে গেল মুক্তি।কারণ, স্যার আজ অফিসে গেলে প্রথমে তারই ডাক পড়বে ; তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।তাই,আর দেরী না করে ব্যাগে একটা আপেল জলদি করে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো মুক্তি।দেরী হলে সেদিন সবই মনে হচ্ছে দেরী করিয়ে দেয়।রাস্তায় রিক্সাও কম দেখা যাচ্ছে।

কি ব্যাপার! আবার হরতাল – টরতাল নাকি!নাহ্, তা হবার তো কথা না – মনে মনে ভাবতে লাগলো সে।

আকাশটা কেমন যেন মেঘলা লাগছে।মনে হয় বৃষ্টি হবে।সাথে সাথে ব্যাগে হাত দিয়ে দেখলো আজ ছাতাটা আনা হয়নি।এরপর কোনমতে একটা রিক্সা পেয়ে জলদি উঠে পড়লো।

এর মাঝে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে।

– আহ্ ! কি সুন্দর একটা পরিবেশ।এমন দিনে কারো কি মন চায় কাজে যেতে।

কিছুক্ষণ পর, রিক্সাওয়ালা কিছুটা চেঁচিয়ে,

– 'খালা, আমার ভাড়াটা দেন তো? '

– 'দেব না কেন, আজব তো! চেঁচিয়ে বলবার কি আছে! খালা কে আপনার? আপা বলেন।'

– 'জে আফা, আমি অনেকবার কইছি।আপনে তো কিছু কন না, আমি কি করুম! '

মুক্তি ভাড়া মিটিয়ে যখন রিক্সা থেকে নামতে নিল আর, ওমনি স্যান্ডেলটা গেল ছিঁড়ে।

ওফফ্! এখন এটাই বাকি ছিল আজকের জন্যে।

মুক্তি তার কলিগ রাসেলকে ফোন দিল।

-' ভাইয়া, স্যার কি এসেছেন? '

– ' না, আজ আসবেন না বোধহয়। একটু আগে ফোন দিয়েছিলেন,আজকের মিটিং ক্যানসিল করতে। উনি অসুস্থ। '

মুক্তি এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল।

যাক বাবা, এবার স্যান্ডেল কেনার সময় পাওয়া গেল।কিছুদূর এগিয়ে একটা দোকান থেকে স্যান্ডেল কিনে এবার, হাঁটতে লাগলো অফিসের পথে।

পেছন থেকে একটা বাইক বার বার হর্ণ দিচ্ছে বার বার।মুক্তি পেছন ফিরে তাকালো না।কারণ, সে তো ফুটপাত দিয়েই হাঁটছে।

– ' কি ব্যাপার মুক্তি! এতগুলো হর্ণ দিলাম তুমি তাকাচ্ছো না যে? '

মুক্তি চমকে গেল,

– ' আরে রাহাত! '

-' অফিস ফাঁকি দিয়ে একা একা ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে।আমাকে কি একটু ডাকা যেত না ম্যাডাম?'

– ' আরে কি যে বলো রাহাত!অফিসেই যাচ্ছি এখন। '

– ' আজ বিকেলে আমার সাথে এক জায়গায় তোমাকে একটু যেতে হবে।'

-' আমি জানি, তুমি কোথায় যাবার কথা বলছো।কিন্ত আজ না। আমাকে কটা দিন সময় দাও।আমি নিজেই তোমাকে জানাবো।'

রাহাতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুক্তি অফিসে কাজে মন দিল।

রাহাতের সাথে মুক্তির সম্পর্কের শুরুটা ছিল সেই কলেজ জীবন থেকে।এখন যদিও চাকরির কারণে দুজনকে কিছুটা ব্যস্ত থাকতে হয়।তাই, রাহাত আর দেরি না করে বিয়েটা সেড়ে নিতে চায়।তবে মুক্তি এ ব্যাপারে কিছুটা উল্টো।মুক্তির এই নিস্তেজ অভিব্যক্তি রাহাতকে মাঝে মাঝে ভাবিয়ে তোলে। মুক্তির জীবনটা ছোটবেলা থেকেই ছিল একটু অন্যরকম।যে সময়টায় সবাই বাবার হাত ধরে স্কুলে যেত, মুক্তি যেত তার মামার সাথে।যদিও, তার আদরের কোন কমতি ছিল না কারো কাছে।মা, নানু আর মামা – এদের ঘিরেই মুক্তির পরিবার। একটু বড় হবার পর সে জানতে পারে যে, কোন এক দুর্ঘটনায় তার বাবার মৃত্যু ঘটে।আর, মুক্তির দাদাবাড়ির কারো সাথেই ওদের কোন যোগাযোগ নেই।কেন বা কি জন্যে এগুলো আজও বোধগম্য নয় তার কাছে।রাহাতদের বাড়িতে গেলে হয়ত এসব নিয়ে নানান প্রশ্ন করা হবে তাকে।যদিও রাহাত এসব নিয়ে মুক্তির কাছে তেমন কিছু জানতে চায় নি, কিন্ত তারপরও…..

মুক্তি মনে মনে ঠিক করলো আজ বাড়ি ফিরে মায়ের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলবে।রাতে খাবার পর মুক্তি দুকাপ কফি নিয়ে মায়ের রুমে ঢুকলো, রাহাতদের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলার জন্যে।তবে মায়ের সাথে কথা বলেও তেমন কিছুই হলো না।মায়ের ওই একই কথা,

– ‘ওদের বলে দিস, আমাদের কারো সাথে যোগাযোগ নেই, ওরা খারাপ মানুষ ব্যাস।এখন যা এখান থেকে। আমার মাথা ধরেছে।’

এটা কেমন কথা। রাহাতের পরিবার যদি মাকে এই প্রশ্ন করে, সে কি একথা বলতে পারবে কখনো।রাগের মাথায় কি সব যে বলে মা!

মুক্তি এবার মামাকে ফোন দিল।মামা কয়েক বছর হলো জাপানে আছেন।তাকে এই ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে বললে হয়ত এড়িয়ে যাবেন না।তবে মুক্তির জানা ছিল না যে,মামাও তাকে নিরাশ করবে।মামা জানালো,

– ‘তোর বাবার কথা আর কি জানতে চাইবে, সে তো আর নেই।আর,দাদাবাড়ির কথা বলে দিস তারা অশিক্ষিত ধরনের লোকজন। তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার মতো না।’

মুক্তি আর কথা না বাড়িয়ে ফোন রেখে দিল।খুব রাগ লাগছে মামার ওপর।মামার কথা শুনে মনে হয়- মুক্তি আজও সেই ছোট মুক্তিই আছে। একটুও বড় হয়নি!

মুক্তির মা,মিতা পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক।তাই অনেক সকালে তাকে বেড়িয়ে পড়তে হয়।এরপর নানু আর নাতনী একসাথে সকালের নাস্তাটা করে।আজ মুক্তি নাস্তা করে অফিসে গেল না।বিছানায় চুপচাপ শুয়ে রইল।কিছুক্ষণ পরে নানু এল মুক্তির রুমে।

-‘ কিরে অফিসে যাবি না? ‘

-‘ না, ফোন করে দিয়েছি। আজ যাবো না।’

-‘ কেন কি হয়েছে, আবার শরীর খারাপ নাকি? ‘

– ‘ না,কিছু না। এমনি।’

– ‘ কি হয়েছে বল আমাকে? ‘

মুক্তি চুপ করে বসে রইল।

– ‘ কি রে বল? ‘

মুক্তি নানুকে জড়িয়ে ধরল শক্ত করে।

– ‘ওরে বাবা কি মেয়ে রে! ব্যাথা লাগছে, মেরে ফেলবি নাকি! হয়েছে টা কি? ‘

মুক্তি সব কথা নানুকে খুলে বললো।

-‘নানু, রাহাতের কথা না হয় বাদই দিলাম।আমার কি বাবার সম্পর্কে জানার কোন অধিকার নেই?আমি তো কিছুই জানি না বাবার কথা। ‘

– ‘ তুই হয়ত সহ্য করতে পারবি না, তাই তোকে বলা হয়নি।’

-‘মানে !? ‘

এরপর নানুর কথাগুলো সত্যিই মুক্তির জন্যে সহনীয় ছিল না।

-‘একাত্তরের সময় সবাই যখন দেশকে স্বাধীন করার নেশায় মত্ত।তোর বাবা তখন পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে হাত মেলায়।আর নানা রকম অপকর্মে লিপ্ত হয়।এসব নিয়ে তোর মায়ের সাথেও অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে।তোর তখন এইসব বোঝার বয়স হয়নি।’

-‘মানে, রাজাকার ছিল! নানু? ‘

-‘তোর বাবা মুক্তিবাহিনী কখন কোথায় আছে, এসব খবর ওই দস্যুদের এনে দিত।একদিন তোর বাবা পাশের গ্রাম থেকে তিন-চার জন যুবতিকে ধরে নিয়ে আসে।ওই নড়পশুদের ভোগের জন্যে।আর, তোর মা ঘরটার তালা খুলে মেয়েগুলোকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে।এতে তোর বাবা অনেক ক্ষেপে যায় মিতার ওপর।ওকে অনেক মারধোর করে।মিতা হঠাৎ বিছানার ওপর তোর বাবার অস্ত্রটা দিয়ে তাকে গুলি করলো। পরপর তিনটা।’

নানু আর কথা বলতে পারছিল না। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।মুক্তি দৌড়ে পাশের রুম থেকে নানু ইনহেলারটা এনে দিল।

-‘ এরপর মিতাকে সাথে নিয়ে আমি আর তোর মামা ঢাকা চলে এলাম। ‘

মুক্তির খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্ত সে আজ কাঁদবে না।কেন কাঁদবে, আর কার জন্যে কাঁদবে!

রাতে মুক্তি কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লো।মা আর নানু কেউ জোর করলো না ওকে।সকালে মিতা মেয়ের রুমে গিয়ে বসলো।মুক্তি বিছানায় চুপ করে বসে আছে।

– ‘ তোর কি খুব খারাপ লাগছে মা? ‘

-‘ না, মা।খারাপ লাগবে কেন! আমার মা-তো একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমার আবার কষ্ট কিসের।তুমি হয়ত দূর-দূরান্তে গিয়ে যুদ্ধ

করো নি।তবে, তুমিও একজন সাহসী যোদ্ধা মা।’

মিতা শাড়ির আঁচল দিয়ে মেয়ের চোখ মুছে দিল।

-‘ মা আমাকে কি একটু তোমাদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাবে।এখানে কেমন যেন ভাল লাগছে না।আর,শোন তুমি কিন্ত একদম টেনশন নেবে না।আমি একদম ঠিক আছি।এই দেখো আমাকে, কিছুই হয়নি আমার।শুধু একটু সবুজ ঘাসের মাঝে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে খুব ইচ্ছে করছে।’

মিতা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।আজ, তার আর কোন দুঃখ নেই হয়ত।যে কথাগুলো মুক্তির অজানা ছিল,সেসব জানার পর সে তার মাকে এত বড় সম্মান দিয়েছে। সেই ছোট্ট মুক্তি আজ সত্যিই অনেক বড় হয়ে গিয়েছে।

?????????? ??

আমার বেডের পাশেই যে বেড, সেটাতে ১০ কী ১১ বছরের একটা বাচ্চা ভর্তি হয়েছে। ওর সাথে শুধু ওর মা’ই আছে। এই কদিনে আর কাউকে আসতে দেখিনি। বেশিরভাগ সময়ই ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রথম দিনেই জিজ্ঞেস করেছে, তুমি চশমা পরো কেনো? আমি বলেছিলাম, ঠিক মতো দেখতে পাই না, তাই। সে হেসে বলেছিলো, ও তার মানে হলো, তুমি অন্ধ? আমিও হেসে দিয়েছিলাম, হ্যাঁ। খুব মজা পেয়েছিলো সে।

কয়েকদিন আগে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বলো তো, পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কোনটি? আমি উত্তর দিয়ে বললাম, তুমি কখনো কক্সবাজারে গিয়েছো? সে অভিমান করে বললো, না, আম্মু নিয়ে যায়নি। তবে আম্মু বলেছে, আমার পা ঠিক হলেই এবার আমাকে নিয়ে যাবে। আমি বললাম, গ্রেইট, তুমি আম্মুর হাত ধরে সমুদ্রে নামবা, একা কিন্তু নামবা না, আচ্ছা? সে সুবোধ শিশুর মতো মাথা নেড়ে বললো, আচ্ছা।

আজকে সকালে যখন পা আমার ড্রেসিং করার পর সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ভাল আছো রোবট ভাইয়া? আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ, তুমি? সে বললো, আমিও ভাল আছি। আচ্ছা, যখন পা থেকে ব্যান্ডেজ খোলে, ধুয়ে দেয় তখন কি তুমি ব্যাথা পাও? আমি হেসে বললাম, না তো, কেনো? সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি তো ব্যাথা পাই। আমি বললাম, তুমি ছোট মানুষ তো তাই। আমার মতো বড় হয়ে গেলে আর ব্যাথা পাবা না। সে হা হা হা হা করে হেসে উঠলো।

প্রায় ১২ দিন ধরে অর্থোপেডিক্স ওয়ার্ডে ভর্তি। ট্রাক উঠে গেছে পায়ের উপর দিয়ে। বেশকিছু রড, শিক ঢুকিয়ে পা দুটোকে মৃত

মানুষের মতো সাদা ব্যান্ডেজে মুড়িয়ে রেখে দিয়েছেন ডাক্তার সাহেবরা। এখন আমার হাতে অঢেল সময়। অফিস নেই, ব্যস্ততাও নেই। সালেকিনকে বলে বেশ কিছু বই আনিয়েছি। ওগুলোই পড়ি। দিনে কেউ না কেউ দেখতে আসে। নানা প্রশ্নের উত্তর দেই। কিভাবে হয়েছে, আমি দেখতে পেয়েছিলাম কি না, কতদিন লাগবে সারতে এইসব হাবিজাবি কথাবার্তা। অবশ্য যারা দেখতে আসেন তারা কিছু না কিছু খাবার নিয়েই আসেন। ওয়ার্ডে যেসব বাচ্চাকাচ্চা আসে তাদেরকে দিয়ে দেই। এখানকার আয়ার একটা মেয়ে বাচ্চা আছে। ৬ বছর হবে বড়জোর। সে বেশি ঘনিষ্ঠ আমার সাথে। ওর মায়ের সাথে আসলেই সে আমার কাছে আসে। দু হাতে দুইটা আপেল কিংবা কমলা দিয়ে দেই, সে ভিষণ খুশি হয়ে তার মায়ের দিকে দৌড় দেয়। প্রতিদিন সকালে এসেই আমার কাছে আসবে।

ইন্টার্ন ডাক্তার হিসেবে যে মেয়েটা এখানে আছে সে খুব ভাল। সেদিন তার নাইট ডিউটি, সে ফলোআপ দিতে যখন আমার বেডের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছেন? আমি বললাম, ভালো, আপনি? সে আমার হাতে বিপি গ্লাফস লাগাতে লাগাতে বললো, আমাদের আর ভাল থাকা! ১৬ ঘন্টা ডিউটি। তাই জানি না, কেমন আছি! আমি বললাম, এ বিউটিফুল মাইন্ড মুভিটা দেখেছেন? উনি আমার দিকে মাথা তুলে বললেন, না, কেনো? আমি বললাম, দেখবেন, দেখে জানাবেন কেমন লাগলো। উনি বিপি গ্লাফস খুলতে খুলতে বললেন, আপনি খুব মুভি দেখতেন? বললাম, না। যা দেখেছি তা খুবই কম, তবে ভাল মুভি দেখেছি। উনি বললেন, আচ্ছা, দেখবো। বাই দ্য ওয়ে, ওয়ার্ডের বাচ্চাগুলো নাকি আপনাকে খুব পছন্দ করে? বললাম, বাচ্চাদের একটু প্রায়োরিটি দিবেন, দেখবেন আপনাকেও পছন্দ করবে।

দুর্ঘটনার তিনদিন পরে নাকি আমার জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞান হয়তো শীতনিদ্রায় গিয়েছিলো। প্রথম দিনের পরের দিন থেকেই মা আছেন। বেড ছোট তাই আমার বেডের পাশেই নিচে পাটি বিছিয়ে ঘুমান। বেশিরভাগ সময়ই অশ্রুসজল চোখে আমার হাত ধরে আমার দিকে তাকান। আরেকটা যে কাজ করেন, সেটা হলো, ব্যান্ডেজ করা পা দুটোতে হাত বোলাতে থাকেন। তখন টপটপ করে পানি পড়ে তাঁর চোখ থেকে। আমি নির্বাক থাকি। কিছু সময় মানুষকে কাঁদতে দিতে হয়, বাঁধা দিতে হয় না, নইলে মানুষ দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। মা যখন আমার দিকে তাকান তখন কেনো যেন মনে হয় চোখ ভর্তি সমবেদনা আমার দিকে। আমি চোখ বন্ধ করি। মন খারাপ করা মানুষের ফেস আমার দেখতে ভাল লাগে না।

গতকালও বড়বোনটা এসেছিল। অবশ্য মানা করে দিয়েছি যেন আগামী দুদিন না আসেন হসপিটালে। আসলেই সারাক্ষণ কান্নাকাটি। সেদিন আসছেন, চিঙড়ি মাছ রান্না করে নিয়ে। কিন্তু আমাকে খাওয়াতে পারেননি। লিকুইড ছাড়া এখন কিছু এলাউ না। এটা নিয়ে কান্নাকাটি করেছেন। ছোটবোনটা সহ্য করতে পারে না বলে সে আসেই না। সারাদিন শুধু দেখি মা'কে কল করে জিজ্ঞেস করে, আমি কী করছি, খাইছি কী না, ঘুমাচ্ছি কী না এইসব। মা কান্নাভরাট কণ্ঠে উত্তর দিয়ে যায়।

সালেকিন যেদিন প্রথম আসলো এখানে, এসেই বললো, এই গনওয়ার্ডে কেনো? তুই তো এখানে থাকতে পারবি না। কেবিন নিতে হবে। আমি বললাম, কে দিবে কেবিন? একটা কেবিনের পেছনে কত মানুষ লেগে আছে, জানিস কিছু? সে বললো, কী হয়ছে? ডিএমসির আইসিইউ ম্যানেজ করে দিতে পারো তুমি, আর নিজের জন্য একটা নরমাল কেবিন ম্যানেজ করতে পারবা না, এটা বিশ্বাস করতে বলো? আমি হেসে বললাম, এটা পেয়িং বেড, ডাক্তারকে বলেছি একটা নরমাল বেড যেন একটু ম্যানেজ করে দেয়। মানে কী? সালেকিন অবাক হয়ে জানতে চাইলো। আমি বললাম, নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল পান। আমার কথাটা ওর পছন্দ হলো না। বিড়বিড় করতে করতে বাইরে চলে গেলো। ডাক্তার মেয়েটা আজ সকালে রাউন্ডে এসে আগের মতই জিজ্ঞেস করলো, ভাল আছেন? আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। আমি বললাম, মুভিটা দেখেছিলেন? উনি একটু অবাক হয়ে বললেন, ও হ্যাঁ, দেখেছি। দারুণ মুভি। ড. জন ন্যাশ। কী অদ্ভুত মানুষের জীবন, তাই না? বললাম, হুম। উনি বললেন, কিছু মনে না করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি? আমি হেসে বললাম, করতে পারেন। যার সাথে আপনার সম্পর্ক সে জানে আপনি এখানে আছেন? না মানে, ভর্তি হবার পর থেকে আপনার পরিবারের বাইরে কাউকে দেখিনি। আপনার বোন বলেছেন, আপনি

নাকি এখনো বিয়ে করেননি। তাই
বয়স হিসেবে কারো সাথে মানবিক সম্পর্ক থাকা এখনকার খুব স্বাভাবিক বিষয় একটা, তাই জিজ্ঞেস করলাম, সরি। আমি বললাম, ধুর, সরির কিছু নেই। আসলে যে ছিলো সে মাস ছয়েক হলো চলে গেছে। সে কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, চলে গেছে মানে? আমি বললাম, চলতি ভাষায় বললে, ব্রেকআপ। সে নিরুত্তাপ হয়ে বললো- ও। তারপরও কি সে জানে না এ দুর্ঘটনার খবর? আমি বললাম, জানি না। তবে একটা জিনিস কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছে। সে বললো, কী? বললাম সে খুব ভাগ্যবতী। চলে গিয়ে ভালই করেছে। সে যদি এখন থাকতো তবে তার অনেক কষ্ট হতো। আমার এই অবস্থা সে না পারতো মেনে নিতে, না পারতো এভোয়েড করতে। মেয়েটার অনেক কষ্ট হতো, নিদারুণ কষ্ট। ওর চোখের কাজল লেপ্টে যেতো কান্নায়। চুলগুলো হয়তো এলোমেলো হয়ে থাকতো। ঠিকমতো হয়তো খেতো না, গোসল করতো না। সারাক্ষণ হয়তো এখানেই পড়ে থাকতো। চোখের নিচে কালি জমে যেতো। চিন্তায় হয়তো শুকিয়েও যেতো। হাসতে পারা যে একটা বড় গুণ সেটাও হারিয়ে ফেলতো। মেয়েটি খুব লাকি। তাই ওর ভাগ্য খুব ফেভার করেছে। আগেই সুখের পথে হেটেছে। ডাক্তার মেয়েটি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখলাম। সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, তাকে দেখতে ইচ্ছে করছে না এখন? আমি বললাম, আচ্ছা ডক্টর, রিপোর্টগুলো তো আজকেই দেবে। তো অপারেশনের ডিসিশন কি আজকেই নিবেন আপনারা? উনি আমার দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। পরে ফাইল গোছাতে গোছাতে বললেন, হুম।

দুপুরের পরপরই ডাক্তার মেয়েটা আবার এলো। আমি বললাম, অপারেশন কবে ডক্টর? উনি কপালের উপর থেকে চশমাটা চোখে এনে বললেন, আগামীকালই। আমি বললাম, গ্রেইট। ব্লাড কয় ব্যাগ লাগবে? সে বললো, চার ব্যাগ লাগবেই আর দু ব্যাগ ব্যাকআপ হিসেবে রাখতে হবে। আমি বললাম, আচ্ছা, আমার বন্ধু আর ভাই আসুক। ম্যানেজ করে ফেলবে ওরা। ডাক্তার মেয়েটার চোখে কিছুটা অশ্রু খেলা করছিল, শুরুতেই খেয়াল করেছিলাম। এখন স্পষ্টত হলো। সে বললো, আমি ম্যানেজ করেছি। সন্ধানী থেকে কালেক্ট করবো। আমি বললাম, ওয়াও গ্রেইট, গ্রেইট। আপনার জন্য এক কাপ চা পাওনা রইলো ডক্টর। আমার অফিসের সামনের টংয়ের দোকানে খুব ভাল চা বানায়। সেখানে খাওয়াবো। উনি আমার দিকে তাকিয়েই রইলেন। ধুপ করে পাশে বসলেন। নিজের চশমাটা চোখ থেকে খুলে বাম হাতে রাখলেন। আমার দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে বললেন, রোবট সাহেব আপনি কী জানেন, আপনি আর কখনো হাটতে পারবেন না? আগামীকাল হাটুর নিচ থেকে দু পা-ই কেটে ফেলে হবে। আর এটা ছাড়া যে আমাদের অন্য কোন উপায় নেই! আপনি কিভাবে আর চা খাওয়াবেন?

কতক্ষণ চোখ বন্ধ করেছিলাম জানি না। চোখ খুলে দেখি উনি নেই। মা পাশে বসে পাগলের মতো কাঁদছেন। জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যায় না, তবে সূর্যের কিছুটা বিকিরণ আসে। যা দেখে মনে হচ্ছে, বৃষ্টি হবে। অনেকদিন হয় বৃষ্টিতে ভিজি না। আজ খুব ভিজতে ইচ্ছে করছে। ছোটবেলা খুব দৌড়াদৌড়ি করে ভিজতাম বৃষ্টি এলেই। জানালার দিক থেকে চোখ সরিয়ে পায়ের দিকে তাকালাম। মৃতদেহের মতো কাফনের কাপড়ের মতো ব্যান্ডেজে মোড়ানো পা দুটি আগামীকালই দাফন হবে। পা'দুটোকে একটু ছুঁতে মন চাচ্ছে এখন।

?? ??????? ??????? :

তরী রিক্সা ছেড়ে দিয়ে ফুটপাত দিয়ে হাঁটছিলো।আর একটু সামনেই ওদের বাড়ি।অন্য কেউ হলে, হয়ত এখানে খামোখা রিক্সা ছেড়ে দিতো না।আজ সারাটা দিন তরীর খুব ভাল কেটেছে।ঠিক যেমনটা সে চেয়েছিলো।তরী বজলুর রহমান সাহেবের একমাত্র মেয়ে।তরীর বয়স যখন মাত্র পাঁচ, তরীর মা আদর রহমান এই ভুবনের মায়া ছেড়ে পাড়ি জমালেন মেঘেদের দেশে।মা – বাবা দুজনের আদর দিয়ে বজলুর রহমান সাহেব মেয়েকে বড় করেছেন।কিছু সময়ে পেরেছেন আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত পুরোপুরি পারেন নি।একজন বাবা কি সত্যিই পারে, মায়ের শূণ্যতা পূরণ করতে ?!

তবে, তরীর কোন আবদার তিনি অপূর্ণ রাখেন নি।তবে, গতপরশু মেয়ের অদ্ভুত ইচ্ছেটা তাকে খানিকটা বিস্মিত করলো।তরী তার জীবনে মোট কতবার রিক্সাতে উঠেছে, তা হাতে গুণে প্রথমে বজলুর সাহেবকে বলতে শুরু করলো।তাছাড়া প্রতিদিন ইউনিভার্সিটিতে যাবার সময় ড্রাইভার মজনু মিয়ার বকবকানিতে, সে রীতিমতো অস্হির হয়ে পড়ে।তার দৃষ্টিতে, তরী এখনো হয়ত দশ কিংবা বারো বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে।তাই, সব কথায় তাকে অহেতুক জ্ঞান বন্টনের অপচেষ্টা ইদানিং সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।অথচ, প্রতিদিন রিক্সায় যাওয়া গেলে, দিনগুলো কি এমন বৈচিত্র্যহীন হতো !

সকালের ঝলমলে রোদ অথবা, ফুটপাতের পথচারীদেরও একটু কাছের কেও বলে মনে হতো।সত্যিই কি মনে হতো ! কাছের মনে না হলেও, দূরের মানুষ হয়ে তারা হয়ত থাকতো না।তরী নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়ে যাচ্ছিলো।গাড়ির স্বচ্ছ জানালাটা যেন চিরচেনা এই শহরটাকে তার কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চায়।বজলুর সাহেবের মেয়ের কথা শুনে হাসি পেল।যদিও, তিনি তা একদমই মেয়েকে বুঝতে দিলেন না।টেবিলে রাখা চশমাটা হাতে নিয়ে, রুমাল দিয়ে গ্লাসটা মুছে নিলেন।
তরীর কথা শুনলে আসলেই যে কারো মনে হবে- মেয়েটা এখনো ছোটই রয়ে গেছে।একটু বেশি নিজের কল্পনার জগতে থাকতে ভালবাসে।অথচ, তরীর এমন আচরণের পেছনে যে কিছুটা তার নিজেরও ভূমিকা রয়েছে ; সে ব্যাপারে বজলুর সাহেব বোধহয় অনবগত।
বাবার অনুমতি নিয়ে তরী আজ সারাটাদিন রিক্সা নিয়ে ঘুরেছে।সাথে ছিল প্রিয় বন্ধু অরণ্য।যদিও, অরণ্যের আজ সারাদিন তরীর মতো করে প্রফুল্ল আমেজে কাটেনি।নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে অরণ্য।বাস কিংবা রিক্সায় এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করা, তার কাছে আর দশটা দিনের থেকে ভিন্ন কিছু নয়।তারওপর, তরীর পাগলামোর কারণে তাকে ক্লাসটাও মিস দিতে হলো।মিথিলা হয়ত কাল ওর দাদাবাড়ি খুলনায় যাবে।এরপর ওর সাথে এক সপ্তাহ দেখা হবার সুযোগ মিলবে না অরণ্যের। জ্বালাতনের জন্য এই দিনটা বরাদ্দ রাখার কি দরকার ছিল তরীর !

পাশাপাশি রিক্সায় অনেকটা সময় দুজনে বসে থাকলেও নীরবতার মোচন ঘটলো না।গোধূলির মায়ায় তরীর মনটা মেঘের মতোই ভেসে বেড়াচ্ছিলো।একটুপর অবশ্য তার গোমরা মুখো অরণ্যের দিকে নজর পড়লো।
– আপনি কি পিন পতন নীরবতা ভাঙ্গিয়ে কিছু বলবেন, স্যার ?

বেখেয়ালি অরণ্য ডুবে ছিলো মিথিলার ভাবনাতে।তাই তরীর কথাগুলো তার কর্ণকুহরে পৌঁছাতে সক্ষম হলো না।তরী আঙ্গুল দিয়ে আলতো করে টোকা দিলো অরণ্যের কপালে।

– এভাবে মুখ গোমরা করে না থেকে, তোর মিথিলাকে এতদিনেও মনের কথাটা বলছিস না কেন !?

অরণ্যের চোখে বিরক্তি।

– সবসময় ওকে ' তোর মিথিলা ' বলে সম্বোধন করবি না, তরী।মেয়েটার নাম মিথিলা, তোর মিথিলা নয়।

মিথিলা ওমনি অরণ্যের কাঁধ চাপড়ে ধরে বললো,

– এই শোন, আমার সাথে একদম মেজাজ দেখাবি না।

– তোর হাত – পা ছোড়াছুড়ির অভ্যেসটা কবে যাবে !

তরী আদরের ভঙ্গিতে অরণ্যের গালটা টিপে ধরলো।

– ছাড়, ঢং দেখাবি না।

– আহারে ! আজ মনে হয়, সকাল থেকেই তোর মনটা মিথিলার কাছেই পড়ে ছিলো।আসলে ভুলটা আমারই।কেন যে বুঝতে পারলাম না ! এখন তোর ছুটি।তুই বাড়ি চলে যা, কাল দেখা হবে।

অরণ্য তাতেও রাজি হলো না।ধানমন্ডির গলিগুলো এ সময়টায় মাঝেমধ্যে বেশ নিরিবিলি থাকে।তাছাড়া তরী এমনিতেও একা চলাচল করতে অভ্যস্ত নয়।

মজনুমিয়া বিরক্তিকর হলেও, বিশ্বস্ত লোক।তাই আগের ড্রাইভারদের কিছুদিন পর পর বদলানো হলেও,মজনুমিয়ার ক্ষেত্রে তরীর বাবাকে সেকথা ভাবতে হয়নি।আর, তরীকে এভাবে রেখে সে নিজেও নিশ্চিন্তে বাড়িতে যেতে পারবে না।অরণ্যের আপত্তির কারণ জেনে তরীর হাসি পেল।

– আমি ছোটবেলা থেকে এখানে আছি অরণ্য।আর একটা গলি পরে আমাদের বাড়ি।কি এমন হবে ! এইটুকু সময় আমাকে প্রকৃতির সাথে একটু একা কাটাতে দে, প্লিজ।

অরণ্য হা-সূচক মাথা নাড়ালো।

– তোর পাগলামো আর গেল না।আচ্ছা, আমি গেলাম।

তরী একাকি হাঁটছে, এলোপাথাড়ি হাঁটা।উদ্দেশ্যহীন ভাবলেশ হাঁটাও বলা যেতে পারে।ওদের বাড়ির গলিটা ছেড়ে, পাশের একটা গলিতে ফুটপাত ধরে হাঁটছিল।একটু সামনে যেতেই দেখলো, অনেকগুলো গোলাপি রঙের কাঠগোলাপ পড়ে আছে।তরী দুটো ফুল কুড়িয়ে নিলো।পাশেই কাঠগোলাপ গাছটা।এতক্ষণ হাঁটার পর তৃষ্ণার্ত তরী গাছটার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।হঠাৎ পেছন থেকে একটা ছেলে কোন কিছু না বলেই, তরীর হাতের ব্যাগটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে সামনে দৌড় দিলো।তরীর চিৎকার শুনে কিছু লোক ছেলেটির পিছু নিলো।তরী নিজেও পেছন পেছন দৌড়াতে লাগলো।ছেলেটি ভয়ে ব্যাগটা অন্য একজনের হাতে ছুড়ে দিলেও, গণপিটুনি থেকে রেহাই পেল না।যে লোকটি তরীর ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তরী এবার তার দিকে এগিয়ে গেল।

– লজ্জা করে না, আপনাদের !

– আপনি ভুল করছেন।ওই দেখুন, আমার বড় ভাই ওখানে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছেন।উনি পেশায় একজন পুলিশ অফিসার।আমরা ভদ্র পরিবারের ছেলে।

– একদম চুপ, ফাজিল কোথাকার।

তরী তেড়ে এলো লোকটির দিকে।অপরদিকে যিনি ফোনালাপে ব্যস্ত ছিলেন, এবার তিনি তরীর আক্রমণাত্মক ভঙ্গি দেখে তড়িঘড়ি করে এগিয়ে এলেন।

– আরে আপু, করেন কি ! থামুন বলছি। শেষমেশ তিনি বোঝাতে সক্ষম হলেন তার এই চাচাতো ভাই নাভিদ অর্থ্যাৎ, তরী এতক্ষণ যাকে দ্বিতীয় ছিনতাইকারী রূপে প্রহারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলো – সে একজন নিরপরাধ ব্যক্তি।

অপ্রত্যাশিত ঘটনার আকস্মিকতায় তরীকে বেশ ক্লান্ত লাগছিলো।বেচারি হুট করে ফুটপাতে বসে পড়লো।নাভিদ ধীর গতিতে

একটু এগোলো।

– আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন ?

– আমি একটু পানি খাবো।

নাভিদ দৌড়ে পাশের দোকান থেকে পানি কিনে আনলো।মাঝে তার হাত থেকে সানগ্লাসটা পড়ে ফেটে গেল।যদিও সেদিকে তার একবারো নজর গেল না।

– চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেই।আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।

– আমি আসলে দুঃখিত।

– আমি নাভিদ।

– ও আচ্ছা, নাভিদ আমি খুব লজ্জিত আমার ব্যবহারের জন্য।

– রিক্সা ডেকে দেই একটা।

– না ঠিক আছে, আমি পারবো।

তরী একটা রিক্সা ডেকে উঠে পড়লো।নাভিদ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো, ওর বাসাটা কোন দিকে তা শোনার জন্য।অথচ, তরী এসব কিছু না বলে রিক্সাওয়ালাকে কেবল বললো,

– ভাই, চলুন।

রিক্সার গতি থেমে না থাকলেও, নাভিদের দৃষ্টি স্হির হয়েছিলো শুধু মেয়েটির দিকে।এক মায়া জাগানো প্রমত্ততা ছিল তার চোখে, যা স্তিমিত করে ছিলো নাভিদের চারপাশটা।কি নাম ছিল তার ? কেন সে জিজ্ঞেস করলো না ? কোথায় যাচ্ছিলো সে ? মেয়েটিকে সে কেন অনুসরণ করলো না ? প্রথম দেখাতেই কি কেউ কারো মনোহরণ করতে পারে ? তাও, আবার এমন পরিস্হিতিতে ! এ হয়ত ক্ষণিকের মোহ ছাড়া আর কিছুই নয় – এই বলে নাভিদ তার অশান্ত মনকে নিঃশব্দে চুপ করালো।

তরী বাড়িতে ঢুকে, বসার ঘরে দেখলো ফুপুকে।কিছু একটা সেলাই করছিলেন তিনি, শাড়ি অথবা ওড়না।হাতের কাজের অসাধারণ গুণ রয়েছে পারভিন রহমানের।রঙিন সুতাকে সুচের ছোঁয়ায় রাঙিয়ে তুলতে ভালবাসেন পরনের কাপড়গুলোকে।তরী অবশ্য এ ব্যাপারটায়, সম্পূর্ণরূপে তার উল্টো।সুচের সঙ্গী সুতো হলেও, তরীর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত ছিল দুটোই।

– আয় মা, কাছে আয়।

– না ফুপু, খুব ক্লান্ত লাগছে।গোসলটা সেরে একটা লম্বা ঘুম দেবো।তুমি আজ রাতে আছো তো ?

– হুম।

– আচ্ছা, আমি রুমে গেলাম।

দুদিন পরের কথা।তরী বাড়ি ফিরছিলো।মজনুমিয়া আজ ছুটিতে।ছোট ছেলেটাকে ডাক্তার দেখাতে হবে, সেকথা সকালে বলেছিলো বজলুর সাহেবকে।তরী ফেরার পথে, একদল ভেসে বেড়ানো মেঘ যেন তার পিছু নিলো।কিছু দূর যেতেই ছুঁয়ে দিলো তার লালশাড়িকে।তরীও যেন প্রেমোন্মত্ত হলো, তার সাথে আলিঙ্গনে।পেছন থেকে কে যেন বললো,

– এক্সকিউজ মি, এই ঠিকানাটা কোন দিকে একটু বলবেন ? আশেপাশে দেখেছি, কিন্ত বাড়ির নাম্বারটা মিলছে না।

তরী ভিজে থাকা টুকরো কাগজটা হাতে নিলো।কাগজে লেখা ঠিকানাটা ছিল ওদেরই বাড়ির।তরী এবার লোকটির দিকে তাকালো।তবে, আগে কখনো তাকে দেখেছে বলে মনে হলো না।একটু মুচকি হেসে, ভুলভাল দিকে পথ দেখিয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে এলো।

তরী বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার প্রায় দেড় ঘন্টা পর দরজায় বেল বেজে উঠলো।পারভিন রহমান দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছিলেন, তরী হুট করে তাকে পেছনে ফেলে দরজাটা খুলে দিলো।কারণ, দরজার ওপাশে এখন কে আছে সেটা তার অজানা নয়।তবে, ওদিক থেকে বিস্ময়ে ভরা একজোড়া চোখে নির্বাক দৃষ্টি ছাড়া ; তার প্রতি আর কিছুই ছিল না।

ঠোঁটে দুষ্টুমি মাখা হাসি নিয়ে তরী জানতে চাইলো,
– কাকে চাই ?
– আমি বাবুই, ইন্টিরিয়র আর্কিটেক্ট।মিসেস পারভিন আমাকে আসতে বলেছিলেন।
তরী ফুপুকে ডাক দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

পারভিন রহমানের ছেলে সেলিম, জাপানে আছে গত আট বছর ধরে।মা আর ছোট বোন সেতুকে ঘিরে সেলিমের যত সুখ আর আনন্দ।পারভিন অনেক কষ্টে ছেলেকে বড় করেছেন।
স্বামি মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় বিয়ের কথা কখনো সে ভাবেনি।সেলিম দেশের মাটি ছেড়ে যাবার পর, বজলুর সাহেব অনেকবার তার বোনকে বলেছেন এ বাড়িতে চলে আসবার জন্যে।পারভিন যদিও সপ্তাহে এ বাড়িতে দু-এক দিন থাকে, তবে এ বিষয়টিতে বরাবরই তার আপত্তি ছিল।সেলিম তার গত কয়েক বছরের উপার্জিত অর্থ তার মায়ের কাছে পাঠিয়েছে, দেখেশুনে একটা ভাল ফ্লাট কেনার জন্য।সেইসাথে, মনের মতো করে সাজাতে বলেছে নতুন ফ্লাটটিকে।এ জন্যেই বাবুইকে আজ আসতে বলা হয়েছিলো।
পারভিন বাবুইয়ের সাথে কথার ফাঁকে তরীকে একবার ডাক দিলেন।তরীকে বাবুইয়ের সাথে তিনি পরিচয় করাতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনি বাবুই বলে উঠলো
– আন্টি, আমি তো ওনাকে চিনি।
– চেনেন ! কিভাবে ?
– না মানে, একটু আগে রাস্তায় দেখা হয়েছিলো।
– মানে ??
বাবুই ঘটনাটা বলতে যাচ্ছিলো, ওমনি তরী বললো,
– আহ্ ! ফুপু, এত প্রশ্ন কেন যে করো তুমি !
– তুই বাবুইকে বলতে না দিলেও, আমি বুঝে নিয়েছি।তুই কি আর শুধরাবিনা তরী ?
পারভিন এবার বাবুইকে বললো,
– দেখুন, তরী যদি কোন দুর্ব্যবহার করে থাকে আপনার সাথে ; তার জন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।
– আন্টি, ইটস টোটালি ওকে।আর, আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন।

এভাবে কিছুদিন পরপরই তরী আর বাবুইয়ের দেখা হতো।বাবুই মানুষ হিসেবে তরীর সম্পূর্ণ বিপরীত।ধীর -স্হির শান্ত প্রকৃতির, কারো কথাতেই হুট করে রেগে যায় না।কিংবা, পাল্টা জবাব দিয়ে তাকে পরাজিতও করতে চায় না।আবার, সামান্য কথাতে তরীর মতো প্রাণ খুলে হাসতেও পারে না।তবে কেন জানি, তরীর কাছাকাছি থাকতে তার ভাল লাগে।মাঝেমধ্যে কোন কাজের বাহানা নিয়ে পারভিন রহমানের সাথে দেখা করার সময় তরীর সাথে দেখা হলে ; তার মনটা ভাল থাকে।এভাবে সম্পর্কগুলো হয়ত পরিণতির অপেক্ষায় এগিয়ে যেতে থাকে।
এদিকে নাভিদের মনের খবর রাখার জন্যে ছিল না কেউ ! কেন সে হারিয়ে যেতে দিয়েছিলো মেয়েটিকে ? সেদিন তার মোবাইলটা কি নাভিদের কাছে ভুল করে রেখে যেতে পারতো না ! সিনেমাতে যেমন করে নায়ক-নায়িকার কাকতালীয় ভাবে বারবার দেখা হয়, তার সাথে তেমনটা কি হতে পারতো না ! একটু হলে, কি এমন ক্ষতি হবে ? তবে অচিরেই যে তার আক্ষেপের সম্পাতি রচিত হতে চলেছে, সে কথা কি নাভিদ বুঝেছিলো ?
ডেস্কে রাখা ফাইলগুলো নিয়ে সকাল থেকে নাভিদ ব্যস্ত।নাভিদের বস ইকবাল সাহেব অফিস থেকে বেরোনোর আগে হুট করে তার কেবিনে ঢুকলেন।

– নাভিদ, আমাকে একটু বেরোতে হবে।পরিচয় করিয়ে দেই,উনি হচ্ছেন তরী।আজই নতুন জয়েন করেছেন।ওনাকে সব কাজ

বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব কিন্ত তোমার, ঠিক আছে।
ইকবাল সাহেব এবার তরীর দিকে তাকালেন,
– মিস তরী, উনি হচ্ছেন আপনার ইমিডিয়েট বস।কোন সমস্যা হলে ওনাকে বলবেন।তাছাড়া, আমি তো আছিই।
তরী হা- সূচক মাথা নাড়ালো।
চাকরির তেমন কোন ইচ্ছে তরীর কখনোই ছিল না।কিন্ত লেখাপড়া শেষে, বাবা আর ফুপুর বিয়ে কিংবা সংসার নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত আলোচনা থামাতে ; তাকে চাকরির সিদ্ধান্তটা নিতে হয়েছে।
নাভিদ বোধহয় অধিক উত্তেজনায় বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।
– হ্যালো, আমি তরী।
নাভিদ কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো।তবে তরী কোন জবাব না পেয়ে আবারো বললো,
– হ্যালো।
– আমাকে চিনতে পেরেছেন ?
নাভিদের প্রশ্ন।
– স্যরি, বুঝলাম না।
নাভিদ সেদিনের স্মরণীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলো।
– ও আচ্ছা, আমি সেদিনের ঘটনার জন্য খুব দঃখিত।

মাস খানেক পরের কথা।তরীকে মাঝেমধ্যে কাজের প্রয়োজনে নাভিদের সাহায্য নিতে হয়।তরীর সান্নিধ্যে নাভিদের সংযমী আচরণটা বিনা কারণেই পাল্টে যায়।যদিও, সেটা তরীর কাছে অহেতুক বিরক্ত দান ছাড়া অন্য কিছু বলে সমাদৃত হয় না।
নাভিদের বেহায়া মনটা কিছুতেই তরীর পিছু ছাড়তে চায় না।কখনো অফিস ছুটির পর বাড়ি পৌঁছে দেবার অনুরোধে অথবা, লাঞ্চের বিরতিতে সে থাকতে চায় তরীর একটু কাছে।বিনিময়ে তরীর দিক থেকে অবশ্য সৌজন্যমূলক হাসির পরিবর্তে, অন্যকিছু সে কখনো পায়নি।
তরী নতুন চাকরি নিয়ে ব্যস্ত হলেও, তা বাবুইয়ের সাথে তার মনের সংযোগ স্হাপনে কোনরকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ; কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়নি।কিন্ত, তাতে কি হবে ?! মনের কথাটা আজও দুজনের দিক থেকেই অজানা।তরীও বাবুইয়ের মতো বলতে চেয়েছিলো বহুবার।দ্বিধাগ্রস্হ তরীর সেকথা বোধহয় আর বলা হলো না।
নাভিদ তরীকে জয় করার অভিপ্রায়ে কোন কিছু না ভেবেই উপস্হিত হলো তরীদের বাড়িতে।সেদিন ছিল ছুটির দিন।তাই বাড়িতে তরীর দেখা না পেলেও, বজলুর সাহেবের কাছে সে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলো।বজলুর সাহেব নাভিদের কথা শুনে ভাবলেন, নাভিদ এবং তরী দুজনেই একে অপরকে পছন্দ করে।তাই তিনি নাভিদের অভিভাবকদের সাথে কথা বলতে চাইলেন।পারভিন রহমানও সেদিন ভাইয়ের বাড়িতেই ছিল।নাভিদকে দেখে তার পছন্দ হলো।তাই, তিনি নাভিদের উপস্হিতিতেই তার বাবা- মায়ের সাথে ফোনে আলাপ সেরে পাকা কথা দিয়ে দিলেন।অথচ তরী কোথায় ? তাকে কিছু না জানিয়েই বাড়িতে এসব ঘটে যাচ্ছে !
আর, পারভিন রহমান ভাবছিলেন মেয়েটা হয়ত মুখ ফুটে ফুপুকে মনের কথাটা বলতে পারেনি।

বাড়ি ফিরে তরী পরিস্হিতিকে কি করে সামাল দেবে, তা ভেবে পাচ্ছিলো না।বজলুর রহমান মেয়েকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন।
– কিভাবে তুই যে বড় হয়ে গেলি মা ! তোকে ছাড়া আমি তো থাকতে পারবো না।
তরীর মুখ থেকে একটি কথাও বের হলো না।সুখ কিংবা দুঃখ কোন আবেগই যেন তার হৃদয়কে স্পর্শ করলো না।শুধু রাগ হচ্ছিলো নাভিদের ওপর।কোন উপায় না পেয়ে তরী বাবুইকে সব জানালো।সেই সাথে ভেবেছিলো সব কিছু শোনার পর, অন্নুদীপ্ত

বাবুইয়ের অন্তর হয়ত তার নীরবতার অবসান ঘটিয়ে ; তরীর কাছে মনের কথাগুলো ব্যক্ত করবে।কিন্ত বাবুইয়ের অভিনন্দন জ্ঞাপন তার ক্রোধের মাত্রাকে যেন দ্বিগুণ করে দিলো।দিশেহারা তরীর মৌনতাকে বজলুর সাহেব এবং পারভিন রহমান সম্মতি হিসেবেই ধরে নিলেন।

মনের বিরুদ্ধে সংজ্ঞর্ষের আঁচড়ে বাবুই ছিল মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত।তরীকে হারাবার যন্ত্রণা তাকে ক্রোধে উন্মত্ত করে দিলো।তরী যদি তার না-ই হয়, তবে কেন সে অন্য কারো হবে !? এমনটা তো হবার নয়, তবে কেন হতে চলেছে !

প্রচন্ড মাথাব্যথা নিয়ে বাবুইয়ের সমস্ত রাত নির্ঘুম কাটলো।

বেশ কয়েকদিন পরের কথা।

এক বিকেলে হঠাৎ করেই বাবুই তরীদের বাড়িতে উপস্থিত হলো।সেদিন বাড়িতে তরী একা ছিল।এতদিন পর বাবুইকে দেখে তরী একটু অবাক হলো,

– কি তাড়িয়ে দেবে নাকি ?

– পাগোলের মতো কি বলছো এসব !

– না, মানে বাড়িতে তো আজ ফুপুও নেই।আমাকে বসতে দিলে যে ! ভয় করছে না তোমার ?

তরী এবার বাবুইয়ের কাছে গিয়ে বসলো।দুহাত দিয়ে স্পর্শ করলো বাবুইয়ের মুখটা।

– তোমাকে ভয় পাবো ! আমি !

বাবুই ওর হাত সরিয়ে দিলো।

– একটু কফি খাওয়াবে ?

– হুম, আমিও কফির কথা ভাবছিলাম।খুব মাথা ধরেছে।

– তাহলে তুমি বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো।আমি কফি নিয়ে আসছি।

– কি যে বলো না, তুমি কেন এসব করবে ?

– এ কথা কেন, আর্কিটেক্ট হয়েছি বলে কি দুকাপ কফিও আমার দ্বারা হবে না।

– আমি কি তা বলেছি ! আচ্ছা যাও।

বাবুই কফি ভর্তি মগ দুটো টেবিলে রেখে তরীর পাশে গিয়ে বসলো।তরী বাবুইকে দেখে উঠে বসলো।বাবুই কিছু না বলেই ওকে জড়িয়ে ধরে।তরীও বাঁধা দিলো না।

– তরী, কেন এমন করলে আমার সাথে ?

তরী জবাবে কিছু না বললেও, তার নয়ননীরে বাবুইয়ের নীল শার্টের বুকের জায়গাটা কিছুটা ভিজে গেল।বাবুই এবার দ্রুতগতিতে তরীর হাতদুটো বেঁধে, ঠোঁটে একটা টেপ আটকে দিলো।তারপর, তরীর মাথাটা একটা মাঝারি আকারের পলিথিনের ভেতর ঢুকিয়ে শক্ত করে

বাঁধলো।সব প্রস্তুতি নিয়েই বাবুই এসেছে।

তরী গোঙানোর সাথে অনেকটা সময় ছটফট করলো।তারপর ওকে নিথর দেখালো।বাবুই তরীকে কোলে তুলে অনেকক্ষণ আদর করলো।তরীর ঘর থেকে বেরোবার সময়, টেবিলের সাথে হোঁচট খেয়ে একটা ডায়েরি হাতে পড়লো বাবুইয়ের।ডায়রিটা বন্ধ করতে গিয়ে দুলাইন তার চোখে পড়লো-

" বাবুই, যদি ভালবাসো তাহলে বলছো না কেন এখনো ? তুমি যদি না আসো তবে, ওই নাভিদের সাথে একটি রাত কাটাবার আগে ; তোমরা কেউ হয়ত আমাকে আর খুঁজে পাবে না। "

এক বছর পর.....জননী মানুসিক হাসপাতালের পনেরো নাম্বার কেবিনের রোগীর নাম – বাবুই। আজকাল সে কাউকে তেমন একটা চিনতে পারে না।মাঝে মাঝে বিছানার পাশে জানালাটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, আর বলে –

‘ ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে....